লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৩ বর্ষ | ২৪তম সংখ্যা

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ আষাঢ়, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ | ২৭ রজব, ১৪৩২ হিজরি | ৩০ ইহ্‌সান, ১৩৯০ হি. শা. | ৩০ জুন, ২০১১ ঈসাব্দ

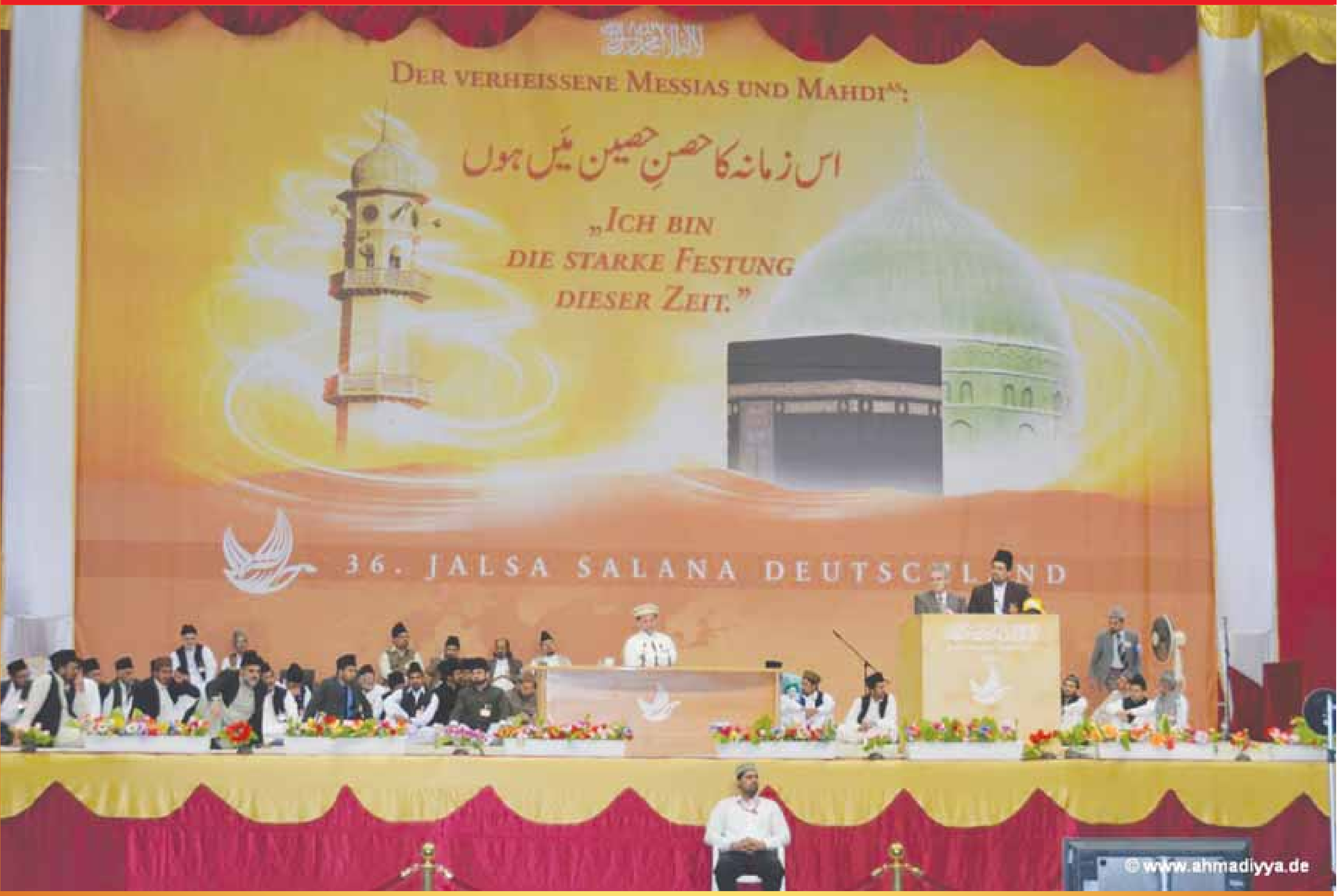

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, জার্মানীর ৩৬তম জলসা সালানা ২০১১

২৪, ২৫ ও ২৬ জুন ২০১১ অনুষ্ঠিত জার্মানীর এই জলসায় প্রায় ৩০ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন-
"যে ব্যক্তি যামানার ইমামকে না মেনে মারা যাবে সে অজ্ঞতার (জাহেলিয়াতের) মৃত্যুবরণ করবে।"

(মুসনাদ : ইমাম আহমদ বিন হাম্বল)

আতফালুল আহমদীয়া ইউ.কে'র ইজতেমায় নযম প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থান এবং আযান প্রতিযোগিতায় তৃতীয়স্থান অর্জন করে প্রবাসী বাঙ্গালী ডা. জাকারিয়ার ছেলে..... ছবিতে তাকে হুযূর (আই.)-এর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে।

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org; www.mta.tv

Courtesy : **INTERNATIONAL TRADING HOUSE**
207/2, West Kafrul (2nd Floor), Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207.
Phone : 88-02-9113176, Fax : 88-02-8121001, Web : www.ithbd.com, E-mail : tushar@ith.com, info@ithbd.com

Amecon Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

সুদিন বা দুর্দিন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় দানকারীদের জন্য রয়েছে পুরস্কার

মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করা প্রসঙ্গে বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে খরচ কর এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না এবং তোমরা সৎকর্ম কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন। (২:১৯৬)।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, ধনী হওয়া অর্থ সম্পদের প্রাচুর্য নয় বরং সম্পদশালী সেই ব্যক্তি যার অন্তর সম্পদশালী (বুখারী)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন, এটা সুস্পষ্ট যে তোমরা দু'টি বস্তুকে মহব্বত করতে পার না। তোমাদের জন্য সম্ভব নয় যে, তোমরা মালকেও ভালবাস এবং আল্লাহ্ তাআলাকেও ভালবাসো। শুধুমাত্র একটিকেই ভালবাসতে পার। এবং তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আল্লাহকে ভালবেসে তাঁর পথে মাল খরচ করে তবে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, তার মালেও অন্যদের তুলনায় অধিক বরকত দান করা হবে। কেননা মাল আপনা-আপনি আসে না বরং আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছায় আসে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তার মালের একাংশ ত্যাগ করে সে অবশ্যই তা পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মালকে মহব্বত করে আল্লাহ্‌র পথে সেই খেদমত পালন করে না যা তার পালন করা উচিত, তবে নিশ্চয়ই সে তার সেই মালকে হারাবে (তবলীগে রেসালাত, ১ম খন্ড)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থ সম্পদ দান করা প্রসঙ্গে তাঁর এক জুমুআর খুতবায় বলেন, যারা চাঁদাদাতা, সদকা-খয়রাতকারী তাদের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করা। আল্লাহকে খুশী করতে চেষ্টা করা। কেননা আল্লাহ্‌র খাতিরে তুমি যা কিছু খরচ করবে, তাঁর সৃষ্টির সেবায় যা কিছু ব্যয় করবে–তা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণ হবে। এর দ্বারা ধর্ম শক্তিশালী হবে আর তাঁর বান্দাদের কল্যাণ হবে।

অনেকে মনে করে আমরা খুব গরীব, আমাদের অবস্থাই এমন যে, চাঁদা দেয়ার ক্ষমতা নেই। ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এমন লোকদের চিন্তা করে দেখা দরকার, তারা চাঁদা না দিয়ে নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র দেয়া বরকত ও রহমতের প্রতিশ্রুতি থেকে বঞ্চিত করছে। পাকিস্তানে গরীব অনেক বেশী। কিন্তু তারা সব সময় বড় আগ্রহ সহকারে চাঁদায় অংশ নিয়ে থাকে। বিভিন্ন তাহরীকের চাঁদায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান দখল করে।

ইসলাম ধর্মে অর্থের কুরবানী কেবল পুরুষদের মধ্যেই আছে তা নয়। বরং এর চমৎকার শিক্ষার কারণে ঈমানের উত্তাপের ফলে মহিলারাও মালী কুরবানীতে অংশ নিয়ে থাকে। নিজেদের গহনা খুলে দান করে দেয়। আজ আমাদের জামা'তের লোকেরাও আঁ হযরত (সা.) এর জামা'তের সাথে শামিল হতে গিয়ে অনুরূপ নমুনা প্রদর্শন করে চলেছে। মহিলারা তাদের গহনা খুলে দেন। তাদের স্বভাবগত কারণে তারা বড় আবেগ ও আগ্রহ নিয়ে গহনা তৈরী করান। তাদের জন্য গহনা পরিত্যাগ বড়ই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু আহমদী মহিলারা ঈমানের দাবীতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাদের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে দেন।

আমাদের আর্থিক চাঁদার বছর শেষ হতে চলেছে। শেষ যুগের প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আবির্ভাবে ইসলামী বায়তুল মালের যে নেযাম, আহমদীয়া খিলাফতের কল্যাণে আমরা লাভ করেছি, এর মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে মালী কুরবানীতে আমাদের দুর্বলতা প্রদর্শনের কোন অবকাশ নেই। তাই যারা এখনও ওয়াদাকৃত চাঁদা পরিশোধ করেননি তারা তাদের ওয়াদাকৃত চাঁদা দ্রুত পরিশোধ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির চাঁদরে নিজেদের আবৃত করুন। মহান আল্লাহ্ তাআলা সকলকে তাঁর রহমতের ছায়ায় রাখুন।

সূচী

৩০ জুন ২০১১

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
জুমুআর খুতবা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
হযরত উসমান আল-গনি ইবনে আফ্ফান (রা.) মূল: আমের সাফির, লন্ডন, ইউকে ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ	১২
প্রসঙ্গ : মিরাজ ও ইসরা শাহ আলম খান	১৪
যরাথুস্ত্র ও তার ধর্ম মোহাম্মদ ফজলুর রহমান	১৭
শেষ যুগের আগমনকারী মাহ্দী অবশ্যই নবী উল্লাহ্ হবেন মোজাফফর আহমদ রাজু	২০
ইসলামে সামাজিক জীবন সরফরাজ এম. এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	২৩
ধর্ম মানুষের জন্য কোন নির্দিষ্ট গন্ডিতে সীমাবদ্ধ ভূখন্ডের জন্য নয় মাহমুদ আহমদ সুমন	২৫
চলুন আমরা তাক্ওয়াশীল মানুষ হই এনামুল হক রনি	২৬
জলসা- ইজতেমার বরকত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা **ফরিদ আহমদ,** Chino, California, U.S.A	২৮
পাঠক কলাম	৩০
এমটিএ দেখুন নিজের ও পরিবারের হেফাজত করুন	৩২
সংবাদ	৩৪

কুরআন শরীফ

সূরা ইউসুফ-১২

قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ
مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖۤ اِلَّاۤ
اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّاۤ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ
قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٦٧﴾

৬৭। সে (অর্থাৎ ইয়াকুব) বললো, ‘তোমরা তাকে অবশ্যই আমার কাছে (ফিরিয়ে) নিয়ে আসবে, এ মর্মে আমার কাছে আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় অঙ্গীকার না করা পর্যন্ত আমি কখনো তাকে তোমাদের সাথে পাঠাবো না। তবে তোমরা নিজেরাই (চরম বিপদে) পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লে সে কথা ভিন্ন। অতএব তারা যখন তাকে তাদের দৃঢ় অঙ্গীকার প্রদান করলো তখন সে বললো, ‘আমরা যা-ই বলছি আল্লাহ্ এর পর্যবেক্ষক।’

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ
وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ
وَمَاۤ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ
اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮। আর সে বললো, ‘হে আমার পুত্ররা! তোমরা সবাই একই দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ্‌র (অমোঘ বিধানের) বিরুদ্ধে আমি তোমাদের কোন কাজে আসতে পারবো না। সিদ্ধান্ত দেয়া একমাত্র আল্লাহ্‌রই (হাতে)। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই ওপর সব ভরসাকারীর ভরসা করা উচিত।

وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ
يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ
نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। আর তাদের পিতা তাদের যেভাবে আদেশ করেছিল তারা যখন সেভাবে প্রবেশ করলো তখন তা আল্লাহ্‌র (অমোঘ বিধানের) বিরুদ্ধে তাদের কোন কাজেই এল না। তবে ইয়াকুবের অন্তরে এক স্বতঃলব্ধ জ্ঞানের (দরুন) যে আকাঙ্খা ছিল তা সে এভাবে পূর্ণ করলো[১৩৯২]। আর নিশ্চয় সে (মহান) জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিল। কারণ আমরা তাকে জ্ঞান দিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ লোক (তা) জানে না।

وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَخَاهُ
قَالَ اِنِّيْۤ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ
بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। আর তারা যখন ইউসুফের সামনে উপস্থিত হলো তখন সে তার (আপন) ভাইকে নিজের কাছে স্থান দিয়ে বললো, ‘নিশ্চয় আমি তোমার ভাই। কাজেই তারা যা করে এসেছে এর জন্য তুমি দুঃখিত হয়ো না।’

১৩৯২। হযরত ইয়াকুব (আ.) বুঝতে পেরেছিলেন অথবা ঐশী-বাণীর মাধ্যমে সম্ভবত সংবাদ পেয়েছিলেন যে মিশরের সেই ব্যক্তি হযরত ইউসুফ (আ.) ছাড়া আর কেউ নয়। সেইজন্যই তিনি তাঁর পুত্রদের পৃথক পৃথকভাবে শহরে প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাই বেনজামিনের সাথে একা সাক্ষাৎ করার ও কথা বলার সুযোগ লাভ করতে পারেন।

হাদীস শরীফ

আল্লাহ্ অহংকারীকে পছন্দ করেন না

কুরআন :
ঔদ্ধত্যের সাথে পৃথিবীতে চলাফেরা করো না। আল্লাহ্ কোন অহংকারী (ও) দাম্ভিককে পসন্দ করেন না। (সূরা লুকমান : ১৯)

হাদীস :
হাদীসে উল্লেখ রয়েছে হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'যার অন্তরে এক কণা পরিমাণ অহংকার আছে সে কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কেউ বললো হে রাসুলুল্লাহ (সা.)! যদি কেউ সুন্দর পোষাক ও জুতা পসন্দ করে? তিনি (সা.) বললেন, অহংকার বলতে আত্মাভিমানে সত্যকে অস্বীকার করা এবং অন্যকে হেয় চোখে দেখাকে বুঝায়' (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা :
হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, অহংকার এমনই একটি আপদ যা মানুষের পিছু ছাড়ে না। মনে রাখবে অহংকার শয়তান হতে আসে এবং অহংকারীকে শয়তানে পরিণত করে। (মালফুজাত, ৬ষ্ঠ খন্ড)

ইসলাম জীবনের উন্নততর বিকাশ চায়। এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে চায় যেখানে মানবতার বিকাশের সাথে সাথে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির উত্তম সম্পর্ক গড়ে উঠবে। উন্নতির পথে সহায়ক এমন প্রতিটি বিষয়-বস্তুকে ইসলাম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছে। মানবতা বিকাশের জন্য বিনয়ী হওয়া আবশ্যকীয়। বিনয়ই মানুষের জন্য মানুষের মাঝে প্রেম, ভালোবাসা ও সহানুভূতির জন্ম দেয়। তাই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, তোমার চলাফেরার মাঝে যেন অহংকারের ছাপ না থাকে। কেননা আল্লাহ্ অহংকারকে পসন্দ করেন না। সাধারণত যে অহংকারী সে কখনও বলে না যে, আমি অহংকারী বা নিজে অহংকারী তা-ও স্বীকার করে না। অহংকারীর পরিচয় তার আমলে। শুধু যে জাগতিক বিষয়েই মানুষ অহংকারী হয় তা নয় বরং আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও মানুষ অহংকারী হয় যা অত্যন্ত ভয়াবহ। অহংকার মানুষকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিপতিত করে। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন কখনও অহংকার না করি আর বিনয়ের পথ অনুসরণের মাধ্যমে খোদার নৈকট্য লাভ করি। আমীন।

> ঔদ্ধত্যের সাথে পৃথিবীতে চলাফেরা করো না। আল্লাহ্ কোন অহংকারী (ও) দাম্ভিককে পসন্দ করেন না।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

মহান সৃষ্টি কর্তার পরিচয়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

"তাঁর কুদরতসমূহ অপরিসীম ও অনন্ত এবং তাঁর বিস্ময়কর কার্যাবলী কুলকিনারা বিহীন। এবং তিনি তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের জন্যে তাঁর নিয়ম–নীতিকেও বদলে দেন। কিন্তু এ বদলানোর ব্যাপারটিও নিয়মেরই আওতাভুক্ত। যখন কোন ব্যক্তি তাঁর দ্বারে এক নতুন আত্মায় উপস্থিত হয় এবং নিজের মধ্যে বিশেষ এক পরিবর্তন কেবলমাত্র তাঁর তুষ্টিলাভের জন্যে সৃষ্টি করে তখন খোদা তাআলাও তার জন্যে নিজের মধ্যে এক রকমের পরিবর্তন সৃষ্টি করেন। অন্য কথায়, সেই বান্দার প্রতি যে খোদা প্রকাশিত হলেন, তিনি যেন ভিন্ন কোন খোদা, যেন সে খোদা নন যাঁকে সাধারণ লোকে জানে।

যার ঈমান দুর্বল সেরূপ ব্যক্তির কাছে তিনি দুর্বলের ন্যায় প্রকাশিত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁর সমীপে এক মজবুত ও শক্তিশালী ঈমান নিয়ে উপস্থিত হয় তিনি তাকে দেখিয়ে দেন যে, তার সাহায্যকল্পে তিনিও শক্তিশালী। অনুরূপভাবে মানবীয় পরিবর্তনসমূহের মোকাবেলায় ঐশীগুণাবলীতেও পরিবর্তনসমূহ সংঘটিত হয়। যে ব্যক্তি ঈমানী অবস্থার ক্ষেত্রে শক্তিহীন যেন সে মৃত, খোদা তাআলাও তাকে তাঁর সাহায্য দানে হাত গুটিয়ে নীরব হয়ে যান যেন নাউযুবিল্লাহ্ মরে গিয়েছেন।

কিন্তু এ যাবতীয় পরিবর্তনসমূহ তিনি তাঁর নিয়ম-নীতির আওতার মধ্যেই নিজের পবিত্রতা অনুযায়ী করে থাকেন। এবং যেহেতু কোন মানুষই তাঁর নিয়মের শেষ সীমা-রেখা টানতে অক্ষম, সেহেতু কোন অকাট্য দলিল ব্যতিরেকে যা উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট হয় ত্বরিৎ এরূপ আপত্তি করা যে, অমুক বিষয়টি প্রকৃতিবিরুদ্ধ, বোকামী বৈ কিছুই নয়। কেন-না যে জিনিসের এখনও সার্বিক সীমারেখা চিহ্নিত হয়নি এবং কোন অকাট্য দলিলও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সে সম্বন্ধে কে-ই বা রায় দিতে পারে!"

(চশমা-এ-মা'রেফাত পৃঃ ৯৬,৯৭)

"তিনি জড় চক্ষু ছাড়া দেখেন, জড় কর্ণ ছাড়া শুনেন এবং জড় জিহ্বা ছাড়া কথা বলেন। এরূপে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আনয়ন তাঁর কাজ, যেমন তোমরা দেখতে পাও যে স্বপ্নের দৃশ্যাবলীতে কোন উপাদান ব্যতীত তিনি এক জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন এবং প্রত্যেক লয়শীল ও অস্তিত্বহীনকে বাস্তবাকারে প্রদর্শন করেন।

বস্তুতঃ এভাবেই যাবতীয় কুদরত (ক্ষমতা) বিরাজিত। মূর্খ সে, যে তাঁর শক্তির মহিমা অস্বীকার করে। সেই ব্যক্তি অন্ধ, যে তাঁর গভীর শক্তিনিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞ। যেসব কাজ তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী বা তাঁর প্রতিশ্রুতি বিরুদ্ধ, সে সব ছাড়া বাকি সবই তিনি করেন এবং করতে সক্ষম। তিনি আপন সত্তায়, গুণে, কার্যে ও শক্তিতে এক-অদ্বিতীয়, এবং তাঁর নিকট পৌঁছবার নিমিত্ত একটি ভিন্ন অপর সকল দ্বারই রূদ্ধ। এই দ্বার কুরআন মজীদ উদঘাটন করেছে।"

(আল্ ওসীয়্যত পুস্তক থেকে)

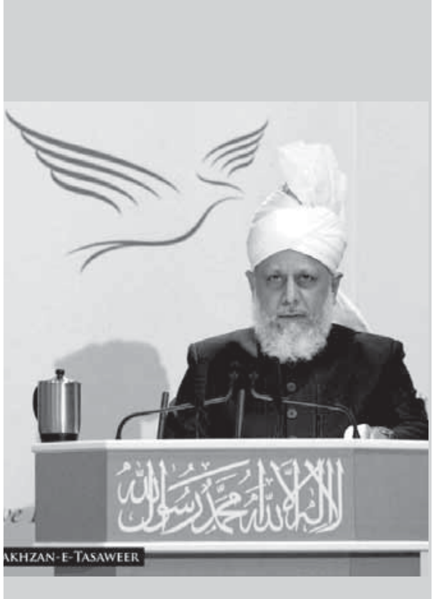

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ২৯ এপ্রিল, ২০১১-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

তাশাহ্হুদ, তাউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আই.) বলেন,

হযরত মসীহ্ (আ.) তাঁর কিছু পুস্তকে নিজের মসীহ্ ও মাহদী হওয়া বিষয়ে ঘোষণা দিয়ে সত্যান্বেষি আলেম, পূণ্যবান এবং সাধারণ মানুষের এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, কোন কারণ ছাড়াই কাফের ফতুয়া লাগানো চিন্তা ভাবনা না করেই আলেমদের অনুসরণের পরিবর্তে আল্লাহ্ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। কিন্তু শর্ত হল, খোলা মন নিয়ে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করুন তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলা সাহায্য করবেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর 'নিশানে আসমানী' নামক পুস্তকে এ পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন যে, পরিপূর্ণরূপে তওবা করে রাতে দুই রাকাত নফল নামায পড়ুন।

প্রথম রাকাতে সূরা ইয়াসিন এবং দ্বিতীয় রাকাতে একুশ বার সূরা ইখলাস পড়ুন; এরপর তিন শতবার ইস্তেগফার করে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে এ কথা বলে সাহায্য প্রার্থনা করুন, তুমি গোপন বিষয়ে অবগত আছ অতএব, এ ব্যক্তি সম্পর্কে আমার কাছে সত্য প্রকাশ করে দাও। আরেকবার তিনি (আ.) তাগিদ করে বলেছেন, এই ইস্তেখারা করার শর্ত নিজের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ রাখা। কিন্তু প্রথম বিষয় তওবাতুন নুসূহ্ করাটাও একটা অনেক বড় শর্ত। এ পদ্ধতিতে তো কেউই আমল করে না, বিশেষ করে আলেমরা তো করতেই পারে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, হৃদয় যদি বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হয় এবং কুধারণা যদি প্রাধান্য পায় তবে তো শয়তানী চিন্তা-ভাবনাই আসবে। কিছু লোক বলে থাকে, আমরা তো অনেক দোয়া করি কিন্তু কোন প্রকার সত্যতা তো আমাদের চোখে পড়ে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মনের মাঝে যদি হিংসা বিদ্বেষ পরিপূর্ণ থাকে তবে তো শয়তানই পথ দেখাবে আল্লাহ্ তাআলা নয়। (নিশানে আসমানী, রুহানী খাযায়েন ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০০-৪০১) একই ভাবে তিনি তাঁর 'কিতাবুল বারিয়্যা' পুস্তকে বিশেষ ভাবে আলেম সম্প্রদায় ও পূণ্যবান লোকদের সম্বোধন করে আল্লাহ্ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনার প্রস্তাব দেন। (কিতাবুল বারিয়্যাহ্ রুহানী খাযায়েন ১৩ তম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৪)

কিন্তু বিদ্বেষে পরিপূর্ণ আলেম সম্প্রদায় এ প্রস্তাব অনুযায়ী কখনোই আমল করে নি এবং সাধারণ লোকদেরকেও নিজেদের সাথে ডুবাচ্ছে। তথাপি এমন অনেক সৌভাগ্যবান লোক রয়েছেন যারা তাঁর এ ব্যবস্থাপত্র অবলম্বন করেছেন, তারা আল্লাহ্ তাআলার পথ নির্দেশনা কামনা করেছেন এবং আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে পথ দেখিয়েছেন। এছড়াও এমন কিছু সৎ প্রকৃতির লোক আছে যারা পূণ্যের অন্বেষণ করে থাকে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে এমনিতেই পথ দেখিয়ে থাকেন। বর্তমান যুগেও আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা প্রমাণের জন্য সে সব লোকদের দিক-নির্দেশনা দান করছেন যারা সত্য অনুসন্ধানে সচেতন। এখন আমি এমন কিছু লোকের ঘটনা বর্ণনা করব।

দফতর ওকালতে তবশীরের রিপোর্ট হল, আরবী ডেস্ক তাদের জানিয়েছে এই এপ্রিল মাসে M.T.A.-3 এ প্রচারিত 'হেবারুল মুবাশেরা' প্রোগ্রামে মিশরের এক বন্ধু জনাব আব্দাহু বকর মুহাম্মদ বকর সাহেব ফোন করে বলেছেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী ইস্তেখারা করেছি এবং সেই রাতেই আমি সত্য স্বপ্ন দেখলাম, আমি আমার একজন বিগত আত্মীয়কে দেখলাম আমি আমার হাতের আঙ্গুল গুলোকে উপরে উঠিয়ে নাড়িয়ে নাড়িয়ে খুব উৎসাহের সাথে কোন কিছু বলছি। কিন্তু আমি আমার কথার আওয়াজ শুনতে পেলাম না। আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। পরের দিন আমি সেই একই পদ্ধতিতে দোয়া করলাম এবং সাথে সাথে আবেদন করলাম, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে কোন সুস্পষ্ট বিষয় দেখাও যার মাধ্যমে আমার হৃদয় খুলে যায়। অতএব পুণরায় আমি সেই স্বপ্নই দেখলাম, আমি আমার সেই আত্মীয়ের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি এবং আমার হাতের আঙ্গুলগুলো বাতাসে উড়িয়ে বলছি,

وَ اللهِ انَّ الْجَمَاعَةَ الْاَحْمَدِيَّةَ جَمَاعَةُ الْحَقِّ

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র কসম, জামা'তে আহমদীয়াই সত্য জামা'ত। এরপর বলেন, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে বয়আত করার সৌভাগ্য দান করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, একদিন দোয়া করেই দমে যেও না বরং এমন গুরুত্বের সাথে দুই তিন সপ্তাহ বা এর অধিক সময় দোয়া করুন। যখন আল্লাহ্ তাআলার কাছে পথ নির্দেশ চাইবে তখন আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই এক সময় পথ নির্দেশ দান করবেন।

আমাদের আমেরিকার একজন মুবাল্লেগ সাহেব লিখেছেন, আব্দুস সেলিম সাহেব ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে ফিজি থেকে আমেরিকার লসএঞ্জেলসে এসেছিলেন। খ্রীস্টান সমাজে বাস করায় সে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে কিন্তু পরবর্তীতে একজন মুসলমানের তবলীগে পুণরায় ইসলাম ধর্মে ফিরে আসেন। তিনি বলেন, এ অধম অর্থাৎ আমাদের মুবাল্লেগ এনামুল হক কাওসারের সাথে তার বন্ধুত্ব হয় এবং সে আমাদের মসজিদে আসা শুরু করে।

তিনি তাকে আহমদীয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন, বই-পত্র দিয়েছেন এবং পরমর্শ দিয়েছেন, তিনি যেন দোয়া করে আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে দিক নির্দেশনা চান।

তিনি তাকে ইস্তেখারা করার প্রকৃত পদ্ধতি বলে দেন। অতএব তিনি ইস্তেখারা করেন, দোয়া করেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে স্বপ্নে দেখেন। পরের দিন তিনি তার অভ্যাস মত অ-আহমদীদের মসজিদে যান, সেখানে আরব থেকে কোন এক শেখ এসেছিল। সেই শেখ উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করার আহ্বান জানালে আব্দুস সেলিম সাহেব দাঁড়িয়ে বলেন, কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী এ যুগ ইমাম মাহদীর আগমনের যুগ। তাই আমি দোয়া করেছি, হে আমার খোদা! তুমি আমাকে বলে দাও, ইমাম মাহদী কি এসেছেন? যদি এসে থাকেন তবে তিনি কে? তিনি বলেন, আমি তাকে বললাম- আমি স্বপ্নে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কে দেখেছি।

এ কথা শুনে শেখ বলে, এটা শয়তানী স্বপ্ন এবং এতে কোন প্রকার সত্যতা নেই। তুমি বেশি বেশি আউ'যু বিল্লাহ্ এবং দরূদ শরীফ পাঠ কর। অতএব তিনি আবার দোয়া করেন এবং বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করেন আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার স্বপ্নে দেখা দেন। তিনি পুনারয় শেখের প্রশ্নোত্তরের সভায় যান এবং এ কথার উল্লেখ করেন। সেই শেখ আবার বলে, এটা শয়তানী স্বপ্ন। আব্দুস সেলিম সাহেব বলেন, আশ্চর্য বিষয়- রাতে আমি অধিক হারে তা'যূয ও দরূদ শরীফ পাঠের পর দোয়া করি হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ইমাম মাহদীর আগমন সম্পর্কে অবগত কর।

কিন্তু আপনার কথামত আল্লাহ্ তাআলা আমাকে স্বপ্ন দেখান না কিন্তু শয়তান স্বপ্ন দেখায়, এটা তো খুবই আশ্চর্যের কথা। এ কথা শুনে মসজিদে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায় এবং তারা বলে একে এখান থেকে বের করে দাও এ কাফের, অপবিত্র। এমনকি সাইড স্ক্রীনের আড়ালের মহিলারাও সাইড স্ক্রীনে থাপ্পড় মেরে মেরে বলা শুরু করে একে এখান থেকে বের করে দাও। তিনি বলেন, আমি সেখান থেকে বের হয়ে আসি। তিনি আমাদের মুবাল্লেগকে এ সব ঘটনার বর্ণনা দেন এবং বলেন এখন আমার কাছে সব কিছু স্পষ্ট হয়েগেছে। কেননা শেখের কাছে তো এর কোন উত্তর নেই, এখন আমি বয়আত করতে চাই। অতএব তিনি বয়আত করেন। যে দিন বয়আত করেন সে দিন রাতেই স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার কাছে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হন এবং তাকে সালাম বলেন, করমর্দন করেছেন ও আহমদীয়াত গ্রহণের জন্য সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, পরের দিন আমি খুব খুশি ছিলাম কারণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমার সাথে করমর্দন করেছেন।

এ সব শেখ বা নাম সর্বস্ব আলেম তো বিগত একশত বিশ বছর যাবৎ সাধারণ মানুষ ও মুসলমানদের প্রতারিত করে যাচ্ছে। আর আজও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সেই কথা অতি উত্তমরূপে পূর্ণ হচ্ছে। তিনি বলেছেন, আমি দেখছি এবং আপনারাও দেখছেন, যারা কাফের বলত তারা আজ নেই কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এখনো জীবিত রেখেছেন এবং আমার জামাতকে বৃদ্ধি করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যদিও সত্তাগত ভাবে আমাদের মাঝে উপস্থিত নেই কিন্তু জামাতের বৃদ্ধি পাওয়া এবং মানুষের কাছে স্বপ্ন যোগে নিজের সত্যতা প্রমাণ করাই জীবনের প্রমাণ।

ইন্দোনেশিয়ার আমীর সাহেব লিখেছেন, ডেডি সোনারিয়া সাহেব তিনি জামা'তে আহমদীয়া সিয়ানজোর পশ্চিম জাভার সদস্য। তার কাছে জামা'তের সংবাদ পৌছায় ২০০৬ইং সালে। তিনি জামা'তের বই পুস্তক পাঠ করা শুরু করেন। তার সবচেয়ে পছন্দের বই ছিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রসিদ্ধ পুস্তক 'ইসলামী উসূল কি ফিলোসফি'। তিনি কয়েক বার এ পুস্তক পাঠের পর বলেন, বই পড়ার পরও আহমদীয়াত গ্রহণের ব্যাপারে দিধাদ্বন্দ্ব ছিল।

একদিন তাকে বলা হয়, তিনি যেন আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে দিক নির্দেশনা লাভের জন্য ইস্তেখারা করেন। অতএব তিনি ধারাবাহিক ভাবে দোয়া করতে থাকেন এবং ২০০৮ইং সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি স্বপ্নে কোন একটি ভাষার একটি বাক্য শোনেন যার অনুবাদ-'তুমি যদি সেখানে যেতে চাও তবে প্রথমে তোমাকে দৃঢ় হতে হবে'। এর অল্প কয়েক দিন পরেই তিনি আরেকটি স্বপ্নে দেখেন যাতে তাকে বলা হয়, তিনি যেন ৪০ দিন রোযা রাখেন। তার রোযার উনিস ও একুশতম দিন রাতে তাকে কাশফ (দিব্যদর্শন) দেখানো হয় যাতে সাদা পোষাকধারী এক ব্যক্তি বাক্যাবলী পাঠ করছেল,

مُحَمَّدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ

আহমদীয়াত সত্য, নিশ্চয়ই তুমি লায়লাতুল ক্বদর লাভ করেছ এবং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-ই ইমাম মাহদী। তিনি বলেন, আমাকে কয়েকবার এ কাশফ দেখানো হয়েছে। অবশেষে ২০০৮ইং সালে তিনি তার স্ত্রীসহ আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু তিনি আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় এ সব সমস্যাদি অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সাহসিকতার সাথে সহ্য করেন।

কেনাডার আমীর সাহেব লিখেছেন, সেন্ট থমাস ওন্টারিওর স্থানীয় বাসিন্দা বিল রবিন্সন। একজন খুব উদ্যোমি খ্রিস্টান ছিলেন। কিন্তু আস্তে আস্তে খ্রিস্টান ধর্ম থেকে তার মন উঠে যেতে থাকে এবং আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করা শুরু করেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে সঠিক পথ দেখাও। তিনি বলেন, এক রাতে আমি খুব দোয়া করলাম, আল্লাহ্ বলে কেউ যদি থেকে থাক তবে আমাকে সঠিক পথ দেখাও। সকালে তিনি দেখলেন, তার ই-মেইল বক্সে জামা'তে আহমদীয়ার প্রচার পত্র পড়ে আছে।

বিল সেটাকে ঐশী নিদর্শন মনে করে জামা'তের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ২০১১ইং সালে বয়আত করেন। তিনি বলেন, মুসলমান হওয়ার পর যখন তিনি গোসল করেন তখন তিনি অনুভব করেন, তার সমস্ত পাপ ধুয়ে গেছে এবং তিনি একজন নতুন মানুষ হয়ে গেছেন। কাজেই যারা সৎ প্রকৃতির হয়ে থাকেন তাদের জন্য অনেক বেশি নিদর্শনের প্রয়োজন পড়ে না। তিনি তার পোষ্টবক্সে একটি প্রচার পত্র দেখেই এটাকে ঐশী সাহায্য মনেকরে আহমদীয়াত সম্পর্কে পড়াশোনা করেন এবং আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

তাজাকিস্তান থেকে সেখানকার স্থানীয় মুয়াল্লেম রুফাত তুকামুফ সাহেব লিখেন, গুলসিজম আয়েম্মহ্ কিনা সাহেবা ২০১০ইং সালে বয়আত করেন। এর পূর্বে তিনি সূফি-ইজমের সাথে যুক্ত ছিলেন। তার প্রথম প্রশ্ন ছিল হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে। তিনি আমাদের কাছে থেকে হযরত ঈসা (আ.) ও ইমাম মাহদী সম্পর্কে শুনে আশ্চর্য হয়ে যান। তিনি বলেছেন, জামা'তে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার প্রায় তিন চার মাস পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেন, কেউ একজন আরবী ভাষায় বোর্ডে কিছু লিখেছে, তিনি তা পড়তে না পারলেও তাকে এর এ অর্থ বলা হয়, তোমাদের মাঝে ইমাম মাহদী আছেন। এর প্রায় দুই সপ্তাহ পর তিনি M.T.A. তে জার্মানীর জালসায় আমাকে বক্তৃতা করতে দেখে তার উপর গভীর প্রভাব পড়ে। তিনি বলেন, পূর্বেই আমাকে দেখানো হয়েছে ইমাম মাহদী এসেছেন এবং ইমাম মাহদীর কথা হচ্ছে। এরপর তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

সিয়েরালিয়ন থেকে মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেন, ডাঃ তামু সাহেব, মিশনারী সালেহ্ লেহায়ে সাহেব ও মুয়াল্লেম মোস্তফা উফানা এ তিনজন দাই-ইলাল্লাহ্ তবলীগের জন্য কেনামা জেলার বান্ডোমা গ্রামে যান। তবলীগ শেষে তারা আল্লাহ্ তাআলার দিক নির্দেশনা লাভের

জন্য আলহাজ্ব মোস্তফা তামুকে ইস্তেখারা করার পদ্ধতি বলেন যে, এ পদ্ধতিতে আপনি আহমদীয়াতের সত্যতা সম্পর্কে জানতে পারবেন। আলহাজী মোস্তফা যিনি তখনো আহমদী ছিলেন না পরদিন সকালে মসজিদে ফযরের নামাযের পর আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়ে সাক্ষী দেন, আল্লাহ্ তাআলা কাছে তার সত্য প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন, তিনি রাতে স্বপ্নে দেখেছেন বাই সাইকেলে করে শহরে যেতে চাচ্ছেন (কিছু লোক আফ্রিকানদের বলে আমরা অনেক অগ্রগামী, উন্নয়নশীল ও জ্ঞাণী, তাদের কেউ কেউ বলে এগুলো থেকে তো আমরা কিছুই বুঝি না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন ব্যক্তিকে পথ দেখাতে বা হেদায়াত দিতে চান তখন তাকে একটি ছোট জিনিসের মাধ্যমেই দিক-নির্দেশনা দিয়ে দেন; যে বুঝার সে বুঝে নেয়। এখন দেখুন এ ব্যক্তি বলছেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম) তিনি বাই-সাইকেলে করে শহর যেতে চাচ্ছিলেন এবং তার সাথে ভারী বোঝা ছিল। তিনি চিন্তিত ছিলেন কিভাবে এ ভারী বোঝা নিয়ে শহরে যাবেন? এমন সময় এক ছেলে এসে সংবাদ দিল যে, আপনার ভাই সালেহ্ (যিনি আমাদের মুয়াল্লেম) আপনাকে ডাকছেন; আমার সাথে গাড়িতে উঠুন।

আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম আমার ভাই সালেহ্ যিনি আহমদী খুব সুন্দর একটি পাগড়ি পরে আছে এবং বলছে গাড়িতে চলে আস। তিনি বলেন, তিনি তৎক্ষণাত বুঝতে পারলেন, আহমদীয়াতের মাধ্যমে আমার সমস্যার সমাধান হবে। প্রকৃত সম্মান এতেই নিহিত। এ স্বপ্ন দেখার পর তিনি এসে বলেন, আমার বয়আত গ্রহণ করুন।

সিরিয়া থেকে আমাদের এক বন্ধু ইয়াসার বুরহান আলহারিরি সাহেব বলেন, আমি আমার কাজিন(চাচাত/ফুপাত ভাই) রতীব আল হারিরি সাহেবের কাছ থেকে জামা'ত সম্পর্কে শোনার পরই আমার মনের মাঝে সত্য দৃঢ় হল এবং আমি বয়আত করার জন্য তৈরী হয়ে গেলাম। দু'দিন পূর্বে আমি দুই রাকাত নফল নামায পড়ে দোয়া করেছিলাম, হে আমার আল্লাহ্! সত্যকে তুমি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দাও এবং ওর অনুসরণ করার সৌভাগ্য দান কর। তিনি বলেন, আমি একজন অশিক্ষিত মানুষ।

আমি স্বপ্নে দেখলাম, কেউ একজন আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, বেশ দূর পর্যন্ত আমি তার সাথে চলতে থাকলাম, এরপর বললাম-তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? সে বলল, কিছুক্ষণ পর তুমি নিজেই দেখে নিবে। অতএব, আমি উঁচু উঁচু আগুনের শিখা ও অনেক মানুষ দেখতে পেলাম। এটা দেখে আমি ভীত হয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম। তখনই আকাশ থেকে নূর অবতীর্ণ হল এবং যখন আমি তা দেখলাম তখন আমি সেই ব্যক্তিকে বললাম এখন আমি আর তোমার সাথে যাব না। কেননা সেই নূর দেখে আমি শান্তি, তৃপ্তি ও প্রশান্তি অনুভব করলাম। এ স্বপ্ন দেখার পর আমার সংশয় দূর হয়ে যায়। এরপর আমি বয়আত করি আল্ হামাদুলিল্লাহ্।

জর্ডানের অধিবাসী মুকাররমা রুবা মুহাম্মদ আলবাওয়ানা সাহেবা বলেন, আমার স্বামীর মাধ্যমে আমি জামাতের সম্বন্ধে অবগত হয়েছি। তিনি ৩ বছর M.T.A. দেখার পর কিছু দিন পূর্বে বয়আত করেন। বয়আত করার পর আমি আমার স্বামীর মাঝে আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করি। তার দোয়া করার ধরণ, নামাযের নিয়মানুবর্তিতা ও আন্তরিকতায় সুস্পষ্ট পরিবর্তন হয়ে যায়। বিভিন্ন সময় তিনি আমাকে জামাতী বিশ্বাস সমূহের কথা বলতেন এবং যুগ ইমামের বই পড়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

বিশেষ করে তিনি 'ইসলামী নীতি দর্শন' পুস্তক পাঠের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করতেন যা আমার কাছে খুব ভাল লেগেছে। এরপর আমি আরবী বই 'আত্ তবলীগ' পাঠ করি, আর এটাও খুব ভাল বই। তাই আমি আল্লাহ্ তাআলা সমীপে আমার হৃদয়ের পরিতৃপ্তির জন্য দোয়া করি। অতএব আমি অনেকগুলো স্বপ্ন দেখি যেগুলোর একটিতে আমি দেখি আমার স্বামী বিভিন্ন রং-এর গোলাপ ফুলে সাজানো একটি উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং তার সাথে অনেক লোক রয়েছে যারা খুব আনন্দিত। আর আমি নিচে একটি গর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি এবং তাকে দেখছি আর তার সাথে মিলিত হওয়ার প্রত্যাশা করছি। অতঃপর আমি তার দিকে উঠা শুরু করি। উপরের দিকের রাস্তা খুব সুন্দর ও চারপাশ সবুজ শ্যামলে ঘেরা এবং মনোরম রং-বেরং-এর ফুলে সুসজ্জিত। উঠতে উঠতে ক্লান্ত হয়ে গেলে আমি বিভিন্ন ধরণের ফুলে সুসজ্জিত নয়নাভিরাম গ্লাসে করে পানি পান করি যা অত্যন্ত মিষ্টি ও এমন সুস্বাদু যেমনটি ইতিপূর্বে কখনো পান করি নি। তিনি বলেন, এরপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যা কিছু বর্ণনা করেছেন সেটাই প্রকৃত পক্ষে ইসলামের মনোরম ও সুন্দর শিক্ষা। কাজেই আমি আমার স্বামীকে বললাম, আমার বয়আতও প্রেরণ করুন।

আলজেরিয়ার একজন ফাতিহা সাহেবা। তিনি বলেন, আমি M.T.A.-র অনেকগুলো প্রোগ্রাম দেখার পর আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করি এবং স্বপ্নে দেখি, আমি অনেক বড় একটি জামা'তের সাথে যুক্ত এবং হযরত খলীফাতু মসীহ্ আল্ খামেস তার প্রচলিত পোষক পরিধান করে এর দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন আর তিনি একটি মসজিদের দিকে দিক-নির্দেশনা দান করছেন যেটির দরজা খোলা এবং মসজিদের ভিতরে নূর চমকাচ্ছে। এ স্বপ্ন দেখার পর আমি ৯ ফেব্রুয়ারী ২০১০ইং তারিখে আমার বয়আতের চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে গভীর আগ্রহের সাথে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সেই রাতেই আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি একটি ফ্রেমে বাঁধা আয়না দেখছি হঠাৎ আমি আমার নিজের চেহারা ফ্রেমে দেখি আর সেই চেহারা অত্যন্ত উজ্জল ও জ্যোতির্ময় ছিল। সারা জীবনে আমি আমার নিজের চেহারা এতো সুন্দর দেখি নি। আকস্মিক ভাবেই সেই ছবি অদৃশ্য হয়ে গেল এবং আয়নায় আমার শৈশবের ছবি এমন উজ্জল ও সুন্দর দেখাচ্ছিল যে আমি স্বপ্নের মাঝেই খুব আনন্দিত ছিলাম। হঠাৎ করেই আমি আমার বাম দিকে তাকিয়ে দেখি আমার একজন সহকারী, যে বলল- দেখো! আমার মাঝে আহমদীয়াতের প্রভাব কিভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।

আলজেরিয়ার অধিবাসী মুহাম্মদ ইয়াহিয়া সাহেব বলেন, কয়েক মাস পূর্বে আমি বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। এর কৃতিত্ব আমার ছেলে সেলিমের, বিভিন্ন চ্যানেল দেখা তার শখ। খুঁজতে খুঁজতে সে M.T.A. পেয়ে যায় যেখানে 'হেবারুল মুবাশেরা' প্রোগ্রাম হচ্ছিল। সে কয়েকটি প্রোগ্রাম দেখে এবং প্রোগ্রামের মাঝে ফোনও করে আর আরবী ওয়েব সাইটের তথ্যাদিও ঘাটাঘাটি করে। তার কাছে যখন কোন বিষয় শরীয়ত বিরোধী হয় নি আর সুস্পষ্ট যুক্তি প্রমাণ পেয়েছে তখন সে বয়আত করে। কিন্তু আমি বয়আতের পূর্বে ইস্তেখারা করি এবং আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, (হে আল্লাহ্ তুমি) এ ব্যক্তি অর্থাৎ সৈয়্যদানা আহমদ (আ.)-এর সত্যতা সম্পর্কে জানাও। পরে আমি স্বপ্নে দেখি, কিছু মানুষ তাদের বাড়িতে প্রচন্ড ঝড়ের মোকাবেলা করছে। তারা তাদের ঘরের বাইরের সেই পর্দা ধরার চেষ্টা করছিল যা বাহির থেকে তাদের বারান্দা ঢাকতো।

কিন্তু তারা তা ধরতে পারছিল না, পর্দা বাতাসে উপরে উঠে যাচ্ছিল আর তারা বেপর্দা হয়ে যাচ্ছিল এবং ঘরের ভিতরের জিনিস-পত্র দেখা যাচ্ছিল। এরপর আমি অনুভব করলাম যেন আসলেই একটি বড় ধরনের ভূমিকম্প হচ্ছে। এতে আমি ভয় পেয়ে অত্যন্ত ভীত স্বরে কালেমা শাহাদাত পাঠ করলাম এবং হৃদয়ের গভীর থেকে ৩ বার পুনরাবৃত্তি করলাম। এতে সব কিছু শান্ত হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই

মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পেলাম। এ সব কিছুই ফযর নামাযের পূর্বে হয়েছিল। যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন আমার চোখ আল্লাহ্ তাআলার ভয়ে অশ্রুসিক্ত ছিল। নামাযের জন্য উঠার পর আমার এ ভয় দূর হয়ে গেল এবং মনে হচ্ছিল আমার হৃদয়ে প্রশান্তি বর্ষিত হচ্ছে। তিনি বলেন, এ স্বপ্নের মাধ্যমে আমার কাছে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর সত্যতা প্রকাশিত হয়ে গেছে। কেননা আমি দোয়া করছিলাম, তিনি নবী করীম (সা.)-এর দাসত্বে লোকদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পানে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন।

তাহের হানী সাহেব লিখেন, লেবান থেকে একবন্ধু জনাব জামিল সাহেব বয়আত করেন। তিনি তার বোন ইয়াসমিনকে তবলীগ করা শুরু করেন কিন্তু সে মানছিল না। আজ তিনি তার চিঠিতে লিখেছেন, এখন সে একটি স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে বয়াত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি লিখেন, শনিবারে আসরের নামায পড়ার পর তিনি হেদায়াত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অনেক দোয়া করেন। রাতে ঘুমানোর পূর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনী পড়ছিলেন। (বয়আত করেন নি কিন্তু এমন শত্রুতাও ছিল না যে বই পড়বে না, তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনী পড়ছিলেন) ইতিমধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং স্বপ্নে হুযূর আনোয়ার (আ.)-কে অন্য কিছু লোকের সাথে বসে থাকতে দেখেন। হুযূর (আ.) জিজ্ঞাসা করেন, কী বয়আত করতে চাও? আমি বললাম, আপনার কথা সঠিক ও যৌক্তিক তাই আমি বয়আত করতে চাই, এরপর আমি স্বপ্নের মাঝে বয়আত করি। ঘুম ভাঙ্গার পর মনে হল, স্বপ্ন বাস্তব হতেও স্পষ্ট ছিল।

ইয়ামেনের মাহমুদ ইয়াহিয়া আলী সাহেব লিখেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা জানার জন্য ইস্তেখারা করি। আমি স্বপ্নে দেখি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খানা কাবার দরজার পাশে সাদা ডালপালা বিশিষ্ট একটি গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন যার উচ্চতা প্রায় ২ মিটার হবে। তিনি (আ.) কোন একটি বই পড় ছিলেন। এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় কিন্তু হুযূরের কথা গুলো মনে ছিল না।

তিনি বলেন, কিছু দিন পর তিনি আবার আমি দেখলাম, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খানা কাবায় মিম্বারে রাসূলে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন। এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। পরবর্তীতে আমি জামা'তের মতবাদ ও আকিদার তবলীগ করা শুরু করলে আমাকে মানুষের হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যস্থল হতে হয়। তারা আমাকে বলা শুরু করে, তুমি মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়েছ। কেউ কেউ আমাকে গালমন্দও করে এবং কেউ কেউ কথা বলাও বন্ধ করে দেয়। কিন্তু ঐশী জামা'তের সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা তো মানুষের পুরনো অভ্যাস যে সম্পর্কে কুরআন শরীফেও উল্লেখ রয়েছে। আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বয়আত করেছি।

ইয়ামেন থেকে জনাব আব্দুল কায়েদ আহমদ সাহেব লিখেন, ২ বছর যাবৎ M.T.A. দেখছি। সেই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি যেগুলোর উত্তর জামা'তে আহমদীয়া ছাড়া আর কারো কাছে ছিল না। M.T.A. তে প্রথমবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দেখেই মন আশ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হতে পারেন না। এরপর আমি অনেকবার সুসংবাদপূর্ণ স্বপ্ন দেখি। এর অল্প কয়েটি উল্লেখ করছি। তিনি বলেন- একবার দেখলাম, আজরাঈল (আ.) বলছেন, তোর হায়াত শেষ। অতঃপর আমাকে একটি সুন্দর ও মনোরম স্থানে নিয়ে গেলেন যেখানে অনারবীয় লোকেরা সাদা রং-এর পোষাক ও পাগড়ি পড়ে ছিল। পরে আজরাঈল আমার মাথায় হাত রেখে বিসমিল্লাহ্ ও সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। এরপর আমার মাঝে বেহুসির অবস্থা অনুভূত হল। (এগুলো স্বপ্নের মাঝে হচ্ছিল) এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। খুব সম্ভব এর অর্থ ছিল, জামা'তে আহমদীয়া সম্বন্ধে জানার পর পবিত্র জীবনের দিকে আমার যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। স্বপ্নে আমি মাসীহুদ দাজ্জালকে দেখেছি, সে ক্রেসের সাহায্যে চলছে, আমি এগিয়ে গিয়ে তার ঘাড় মটকিয়ে দিলাম। আমার কাছে এর ব্যাখ্যা মনে হয়েছে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নের পর আমার এবং আমার ঈমানের কোন ক্ষতি হবে না।

কিছুদিন পর স্বপ্নে হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মকে পিঠ ফিরিয়ে চলে যেত দেখি। আমার কাছে এর ব্যাখ্যা মনে হয়েছে, এখন খ্রীস্ট ধর্মের পতনের যুগ এসে গেছে। এরপর হযরত নবী করীম (সা.)-কে দেখি, তিনি হেলান দিয়ে বসে আছেন আর আমরা তাঁর নূরানী চেহারার দিকে তাকিয়ে আছি। তাঁর রং মুক্তার মতো। একবার আমি হযরত খলীফাতু মসীহ্ আস সালেস (রহ.)-কে স্বপ্নে দেখি এবং হুযূরের সাথে সাক্ষাতের সময় আমি তাঁর হাতে চুম্বন করে কাঁদতে শুরু করি। তিনি অত্যন্ত দয়াদ্র চিত্তে বলেন, 'চল নামায পড়ি' পরে আমরা নামায পড়ি। পরবর্তীতে তিনি বয়আত করে নেন।

নাইজেরিয়া থেকে আমাদের মুবাল্লেগ নাদীম সাহেব লিখেছেন, বেনুভে স্টেটের এক ইমাম খালেদ শোয়ায়েব সাহেবের সাথে আমাদের মোয়াল্লেমের যোগাযোগ হয়। তাকে জামা'তের বই পুস্তক পড়ার জন্য দেয়া হয়। তার আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং তিনি জামা'তের হেড কোয়ার্টার আবুজাতে আসেন ও মুবাল্লেগ সিলসিলার সাথে প্রশ্নের মাধ্যমে যথেষ্ট আলোচনা করেন। এরপর আরো কিছু আরবী বই পুস্তক নেন। কিছু দিন পর ইমাম সাহেব বলেন, এখন আমি পুরোপুরি আশ্বস্ত আর আমি স্বপ্ন দেখেছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নাইজেরিয়াতে অনেক বড় সমাবেশে বক্তৃতা করছেন এবং আমি সেই বক্তৃতাটি হাওসা ভাষায় অনুবাদ করছি।

বক্তৃতা শেষে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে দু'টি কলম ও একটি বই দেন। এখন আমি পুরোপুরি আশ্বস্ত এবং মনে-প্রানে আহমদী হয়ে গেছি। অতএব তিনি তার নিজের পক্ষ থেকেই একটি পত্র হাওসা ভাষায় রচনা করেছেন যাতে তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবী উল্লেখ করেছেন। তিনি তাতে বলেছেন, তিনি জামা'তের বই পাঠ করেছেন যাতে 'আল্ মসীহুন নাসেরি ফিল হিন্দে' ও 'আল কোওলুস সারিহ্ ফি যোহুরিল মাহদী ওয়াল মাসীহ্' অন্তর্ভূক্ত। আর আমি এ বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ই সেই মসীহ্ যাঁর জন্য আমরা অপেক্ষায় ছিলাম। অতএব আমি জামা'তকে গ্রহণ করেছি। চিঠিতে তিনি এ কথাও লিখেন, অবশিষ্ট সম্মানিত ইমামদেরকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে, আপনারা এ জামা'তকে কবুল করুন।

ইমাম সাহেব এ কথাও লিখেছেন, তিনি নিজের পক্ষ থেকেই 'আল কাওলুস সারিহ্ ফি যোহুরিল মাহদী ওয়াল মাসীহ্' পুস্তকটি হাওসা ভাষায় অনুবাদ শুরু করে ছিলেন। তিনি বলেন কিন্তু কিছুদিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখলাম, একজন ফর্সা লোক যিনি সাদা পোষাক পরিহিত ছিলেন আমার কাছে এলেন এবং বললেন, আগে 'আল মাসীহুন নাসারী ফিল হিন্দে' পুস্তকটি অনুবাদ কর, এটি আমার বই আর এ অনুদিত বইটি কোগি স্টেটে নিজের লোকদের কাছে পৌছাও। অতএব আমি এ পুস্তকের অনুবাদ শুরু করে দিয়েছি যা প্রায় শেষ। তিনি বলেন, আমার কিছু শিষ্য রয়েছে তাদের কাছেও আহমদীয়াতের বাণী পৌছাব ইনশাআল্লাহ্।

বুরকিনাফাঁসু থেকে আমাদের মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেছেন, আমাদের একজন মুয়াল্লেম তার যেরে তবলীগ বন্ধু জায়লা আবু বকরকে বলেছে, তুমি যদি জামা'তে আহমদীয়ার সত্যতা পরীক্ষা করতে চাও তবে আমি একটি পরামর্শ দিচ্ছি। আর তা হল, বিনা ব্যতিক্রমে প্রতিদিন আপনি দুই রাকাত নফল নামায পড়ুন

এবং এতে আল্লাহ্ তাআলার কাছে শুধুমাত্র আহমদীয়া জামা'তের সত্যতা সম্বন্ধে জানতে চান। ইনশাআল্লাহ্ তিনি আপনাকে সঠিক পথ দেখাবেন। অতএব তিনি এমনই করেন এবং একদিন জায়লা আবু বকর সাহেব স্বপ্নে দেখেন, ফর্সা মত এক ব্যক্তি এসে বলল উপরে উঠে এসো। মনে হচ্ছিল, সেই ফর্সা মত ব্যক্তি মাটি থেকে উপরে চেয়ারে বসা এবং আমাদের ডাকছেন। জিলা আবু বকর সাহেব বলেন, স্বপ্নে আমার সাথে আমাদের গ্রামের ইমাম সাহেবও ছিলেন। যখন এই ফর্সামত ব্যক্তি আমাদেরকে উপরে উঠতে বললেন দেখানো হয়েছে তখন তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ছবি দেখে বলেন, আমি ইনাকেই স্বপ্নে দেখেছি আর তিনি আমাদেরকে ঈমান আনার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বয়আত করেন।

সিরিয়া থেকে মাহমুদ ঈসা সাহেব বলেছেন, M.T.A.- এর সাথে আমার পরিচয় আমার এক চাচাত ভাইয়ের মাধ্যমে সে একজন ডাক্তার এবং জামা'তকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অন্তর্ভূক্ত। সে বিদ্রুপের ভাষায় বলেছে, এক ব্যক্তি ইমাম মাহদী হওয়ার দাবি করেছে, তার হাতে বয়আতকারীরা সর্বত্রই রয়েছে এবং একশত বছর পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তার কাছ থেকে আমি M.T.A. সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করি।

প্রথমে আমার কাছে খুব কষ্ট লাগে এবং এ কথা ভেবে কিছুটা হতাশ হই যে, ইমাম মাহদী এসে চলেও গেলেন আর আমরা কিছু জানতেও পারলাম না, যখন কিনা আমি বিশেষ ভবে অপেক্ষা করছিলাম, তিনি এসে আরবের মুসলমানদের স্বাধীনতা দান করবেন। আমি মনে মনে ভাবলাম এ ব্যক্তি কিভাবে মানুষকে স্বাধীনতা দাতা হতে পারেন যখন তার কাছে কেউ বয়আতই করে নি। যাই হোক, আমি আমার ভাইকে বললাম, হতে পারে এ ব্যক্তি সত্য কিন্তু সে আমার কথা মানল না। তিনি লিখেছেন, আমি কোন সালেহ বা পূণ্যবান মানুষ নই বরং আমি একজন নাস্তিক মানুষ। নামায পড়তাম না, মদ পান করতাম তাথাপি সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের অন্বেষণকারী ছিলাম। চার বছর পূর্বে আমি রাসূলে করীম (সা.)-কে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি (সা.) তাঁর তাবুতে ছিলেন এবং তাঁর পাশে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) উপস্থিত ছিলেন। সামনে এগিয়ে গিয়ে আমি একজন উজ্জল মুখাবয়বের অধিকারী মানুষকে দেখতে পেলাম।

আমি যখন আশে পাশের লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তির তো দাড়ি নেই তখন তারা বললেন, এটা হল রাসূল করীম (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বের চেহারা। ঘুম ভাঙ্গার পর আমি খুব আনন্দিত ছিলাম। দুই বছর পূর্বে যখন আমি M.T.A. দেখা শুরু করি তখন আমি বুঝতে পাড়লাম স্বপ্নে আমি যে চেহারা দেখেছিলাম তিনি হলেন সৈয়্যদানা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। আমি অত্যন্ত আশ্চার্য্য হয়ে আমার স্ত্রীকে বললাম, পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে, হুযূরের দাড়ি আছে। বাকি চেহারা অবিকল তেমনই ছিল। তিনি বলেন, আমি বয়আত করতে দেড়ি করেছি কারণ আমার আমল ভাল ছিল না। আমি জামা'তে অন্তর্ভূক্ত হয়ে জামা'তের দুর্নামের কারণ হতে চাই নি। এ হল নতুন আগমনকারীদের চিন্তা এবং আমাদের পুরাতনদের জন্যও এটি চিন্তার বিষয়। তিনি বলেছেন, আমি একটি লেবাননী পত্রিকা 'ইসতুরুত'-এ লেখালেখি করি এবং কবিতাও পাঠ করি। আমার কাব্যগ্রন্থ রচনার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যখন আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পঙ্গতি পাঠ করেছি এরপর আমার জীবনটাই বদলে গেছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পঙ্গতিগুলো অসাধারণ।

কিরগিস্তান থেকে আমাদের মুবাল্লেগ লিখেছেন, তেনছতেক সাহেব নামের এক যুবক তিনি তার নিজের ঘটনা নিজের ভাষায় বলেন, কিছু যাবৎ আমি জামা'তে আহমদীয়া সম্বন্ধে তথ্যদি সংগ্রহ করছিলাম। কিন্তু তখনো পর্যন্ত মনটা বায়াত করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এমনই সময় একরাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম, ছাদে একটি কাল মূর্তির মত কিছু একটা চোখে পড়ল তখনই আমি সূরা ফাতিহা ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করলাম। এরপর স্বপ্নে আমি একটি সাদা পরিষ্কার কাগজ দেখতে পেলাম এতে আরবীতে কয়েকটি লাইন লেখা ছিল। আমি সেগুলো পড়ার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু আমি তা পড়তে পারছিলাম না। এর কিছুক্ষণ পরই দেখলাম এর বাম দিকের উপরের কোনে রাশিয়ান ভাষায় লেখা রয়েছে 'ইসলামই প্রকৃত ধর্ম' এবং উচ্চ স্বরে শুনতে পেলাম, 'আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম'। এ স্বপ্ন দেখার পর আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় এবং আমি বয়আত করি।

ইন্দোনেশিয়ার আমীর সাহেব লিখেছেন, জনাব রুনী পিছারুনী সাহেব পশ্চিম জাকার্তা অধিবাসী ছিলেন। তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করার পূর্বে স্বপ্নে একজন সাদা পোষাক ধারী নূরানী ব্যক্তিকে দেখেন, যিনি তার মাথায় পাগড়ীও পরে রেখেছিলেন। এ স্বপ্ন তার উপর গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে ছিল। কিছু দিন পর তিনি তার এক বন্ধুর বাড়ি যান এবং ছবিতে সেই ব্যক্তিকেই দেখেন যাকে তিনি স্বপ্নে দেখে ছিলেন। তিনি সেই ছবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তার বন্ধু বলে, এ ছবি ইমাম মাহদী ও জামাতে আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর। এরপর রুনী সাহেব জামাতী বই পড়া শুরু করেন এবং তার স্ত্রীর বক্তব্য কোন কোন সময় তিনি ১০/১২ টি ছোট ছোট জামাতী বই মাত্র ২ দিনেই পড়ে ফেলতেন। শেষ পর্যন্ত ২০০৮ইং সালে তিনি বয়আত করেন। গত কিছুদিন পূর্বে ইন্দোনেশিয়াতে যে তিনজন শহীদ হয়েছেন তিনি তাদের একজন।

বেনিনের আমীর সাহেব লিখেছেন, বারসালা রিজিওনের গ্রাম 'একুকু' তে আমাদের স্থানীয় হোসাইনী আলীও সাহেব কয়েক বাব তবলীগের জন্য গিয়েছেন। সেখানকার ইমাম মৌলভী আব্দুস সামাদ সাহেব জামা'তের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। সেখানে বয়আত পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধ সৃষ্টি করতেন। এই ইমামের সাথেও কয়েকবার আলোচনা হয়েছে কিন্তু তিনি বিরোধিতায় অটল থাকে। মুয়াল্লেম আলী সাহেবও বলেন, প্রায় আট মাস সেই মৌলভী সাহেবের সাথে তার যোগাযোগ ছিন্ন ছিল। একদিন সকালে উল্লেখিত মৌলভী সাহেব তাকে ফোন করেন এবং গ্রামে গিয়ে সাক্ষাত করতে বলেন। তিনি তার কাছে গেলে মৌলভী সাহেব বলেন, রাতে আমি স্বপ্নে আপনাদের ইমাম খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেসকে (হুযূর বলেন, আমাকে) দেখেছি এবং তিনি বলছিলেন, কিসের অপেক্ষা করছ? জামা'তে যোগ দাও আর এ কথাটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

তিনি বলেন, তাঁর প্রতাপের কারণে আমি তাঁকে কোন উত্তর দিতে পারি নি। এর মাধ্যমে আমাকে বুঝানো হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এটি সুস্পষ্ট নিদর্শন যে, আহমদীয়াত সত্য এবং একে গ্রহণ কর। এরপর থেকে মৌলভী সাহেব বিরোধীতা ছেড়ে দিয়েছেন এবং তার অন্যান্য সঙ্গী সাথীদের জামা'তের প্রতি আসক্ত করছেন। তিনি বলেন, ইনশাআল্লাহ্ সবাইকে নিয়ে জামা'তে যুক্ত হব। যাই হোক তার বিরোধীতা বন্ধ হওয়ায় সেখানে বয়আত হয়েছে এবং উল্লেখিত ইমামের মাধ্যমে ৫১টি বয়আত পাওয়া গেছে।

ইন্দোনেশিয়ার আমীর সাহেব লিখেছেন, স্নেহাস্পদ ইদ্দাহ্ সেকান্দিয়ানা জামা'তে আহমদীয়া পারোমের সদস্য। যদিও সে অল্প বয়স্কা মেয়ে ছিল তথাপি সে কয়েকবার ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাথে স্বপ্নে সাক্ষাৎ করেছে। সে জানত না কে ইমাম মাহদী? সে নকশাবন্দি ফির্কায় যোগ দেয় কিন্তু সে তার স্বপ্নে দেখা ইমাম মাহদীকে সন্ধানে সফল হতে পারে নি। ২০০৭ইং সালের মে মাসের একদিন সে তার

নতুন প্রতিবেশীকে দাওয়াত করে। ইনি আমাদের মুবাল্লেগ জাফরুল্লাহ্ পোন্ত সাহেব। ইদ্দাহ্ সিকান্দিয়ানা তাদের ঘরে প্রবেশের পর তার শরীর কেঁপে উঠে। সেখানে তখন M.T.A. চলছিল এবং তাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আর রাবে (রহ.)-এর প্রোগ্রাম চলছিল। তা দেখে সে বলে, ইনি তো সেই ব্যক্তি যাকে আমি দেখতাম। অতঃপর ২৪ মে ২০০৭ তারিখে সে বয়আত করেন।

কিরগিস্তানের কাস্তবোয়েও সাহেব কয়েকবছর পূর্বে লন্ডন শহরে বয়আত করেন, বর্তমানে তিনি কিরগিস্তান জামা'তের প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, বয়আতের পূর্বে আমি ইসলাম ধর্ম পছন্দ করতাম না। ধর্মের সাথে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। আহমদী হওয়ার প্রায় দুই বছর পূর্বে আমি একটি স্বপ্ন দেখি, আমার মতে এখন তা পূর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, এক রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম, আমার বড় ভাই নুর লাল আমাকে বলছে, আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবী হয়ে এসেছি, আমাকে বিশ্বাস কর।

আমি বললাম, আমি বিশ্বাস স্থাপন করছি, এ কথা শুনে তিনি (তার ভাই) বলেন, আপনারা সবাই জান্নাতে যাবেন কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার জন্য আল্লাহ্র রাস্তায় অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক। এরপর তার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। দুই বছর পর তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক 'আল ওসীয়্যত'-এর কিরগীজ ভাষায় অনুবাদ হওয়ার পর তিনি তা পাঠ করে ওসীয়্যত করেন। তিনি বলেন, দুই বছর পূর্বে স্বপ্নে যা কিছু দেখেছি আজ তা পূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা আমাকে পূর্বেই আহমদীয়াতের সত্যতা সম্পর্কে বলে দিয়েছেন যে ওসীয়্যত একটি ঐশী ব্যবস্থাপনা। এতে অন্তর্ভূক্ত হওয়া আমার জন্য কল্যাণকর।

আলজাজায়েরের আব্দুল কাদের সাহেব বলেন, ২০০৪ সালে আমি নবী করীম (সা.)-কে দুই ব্যক্তি হিসেবে স্বপ্নে দেখেছিলাম। একজন ছিলেন বৃদ্ধ এবং অন্য জন ৪৫ বছর বয়স্ক মানুষের অবস্থায়, যার লম্বা দাড়ি এবং মাথায় পাগড়ি ছিল। অতঃপর ২০০৬ সালে আবার নবী করীম (সা.)-কে দুই ব্যক্তি হিসেবে স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য হয়। হুযূরের চেহারা মোবারক ফর্সা ও নূরানী ছিল এবং তিনি বলেছিলেন, 'আনন্দিত হও, ইনি আল্লাহ্ তাআলার রাসূল।' এর দুই মাস পর আমি M.T.A. তে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর ছবি দেখি যিনি সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি লাগাতার ১৫-২০দিন ঘরে বসে M.T.A.-এর প্রোগ্রাম দেখেন এবং বয়আত করেন।

কঙ্গোর আমীর সাহেব লিখেছেন, দীদীর গংগালাহ্ সাহেব লোগো মাসী শহরে ওকীল। তিনি খ্রীস্টান ছিলেন। কয়েক মাস যেরে তবলীগ ছিলেন তখনো বয়আত করেন নি এমন সময় এক রাতে স্বপ্নে দেখেন, অনেকগুলো ভয়ঙ্কর জঙ্গলী জন্তু ও জানোয়ার তার উপর আক্রমণ করছে। তার আর কিছু মনে ছিল না কিন্তু তিনি শুধু আল্লাহ্ বলে সেগুলোকে ফু মারতেই হিংস্র জন্তুগুলো পড়ে যাচ্ছিল। এ স্বপ্নের ধারাবাহিকতা অনেক্ষণ পর্যন্ত চলে। সকাল হতেই তিনি মিশন হাউজ আসেন। তিনি খুব উত্তেজিত ছিলেন এবং সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদেরকে তিনি খুব উৎসাহের সাথে স্বপ্ন শোনাচ্ছিলেন এবং সাক্ষ্য দিচ্ছেলেন ইসলাম সত্য ধর্ম এবং জামা'তে আহমদীয়া সত্য। অতএব তিনি সে দিনই বয়আত করে জামা'তে অন্তর্ভূক্ত হন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে জামা'তের সাথে ওতপ্রোতভাবে জুড়ে আছেন।

মিশরের সামি মোহাম্মদ ইরাকী সাহেবের বয়আতের ৩ বছরের অধিক সময় পূর্বের কথা, তিনি বলেন আমি একজন পরিচিত খ্রীস্টান পাদ্রির ইসলামের উপর আক্রমণ ও নবী করীম (সা.)-এর মর্যাদার অবমাননা শুনতাম এবং মনে মনে কুড়ে কুড়ে মরতাম। কেননা আমি নিজেকে এর উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে অক্ষম পেতাম। এ অনুভূতি আমাকে ভিতরে ভিতরে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। আমি মিশরের একটি মসজিদের খতিব ছিলাম কাজেই ইসলামী শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক দূর পর্যন্ত জ্ঞান ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু বুঝতাম না, একজন মুসলমান কেন এই প্রতারণার উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে অসহায় ও অক্ষম।

আমি যখন ইন্টারনেটে এ বিষয়ে গবেষণা করলাম তখন এ সিদ্ধান্তেই উপনিত হলাম যে, বিগত তফসীর ও আলেম সম্প্রদায়ের পন্থা এই পাদ্রিদের উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যার্থ। বরং তাদের জন্যই পাদ্রিদের আপত্তি করার সাহস হয়েছে। হঠাৎ করেই আমি মোস্তফা সাবের সাহেবের 'আজুবা আনিল ঈমানে' বইটি পেলাম। তার সম্পর্কে অধিক জানার চেষ্টা করলে আমি আহমদীয়া জামা'তের ওয়েব সাইট ও M.T.A. -এর সাথে পরিচিত হই। অতএব যখন আমি আরো বেশি পড়াশোনা করলাম এবং M.T.A. তে প্রোগ্রাম দেখলাম তখন আমার বিশ্বাস দৃঢ় হল যে, এ জ্ঞান কোন মানুষের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ফল হতে পারে না। যাই হোক দুই বছর আমি এ ফয়েজ অর্জন করি যার সারসংক্ষেপ আমি কুরআন করিম পেয়ে গেছি।

এরপর আমি স্বপ্নে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) -কে দেখি। তিনি আমার হাত ধরে একস্থানে নিয়ে যান যেখানে প্রিয়ভ্রাতা হানী তাহের সাহেব, তামীম আবু দাক্কা সাহেব ও তাহের নাদীম সাহেব একটি দস্তরখানের পাশে বসেছিলেন। তিনি (আ.) আমাকেও তাদের সাথে বসিয়ে দিলেন। এ সত্য স্বপ্নের পর আল্লাহ্ তাআলা আমার হৃদয় বয়আত করার জন্য খুলে দিলেন।

সাফিয়া উলগা একজন রাশিয়ান মহিলা, তিনি ২০০৯ইং সালে বয়আত করেন। তিনি তার স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন যে, রমযান মাসে শেষ দশ দিনে তিনি স্বপ্নে দেখেন, যেন তার জীবন দুই ভাগে বিভক্ত দাবার মত। যেন খুব কষ্ট। তাকে কেউ একজন বলছে, মাঝখানে যেতে যেতে সব কিছু বদলে যাবে। পরে দ্বিতীয় অংশে পৌঁছতেই একটি পরিস্কার সবুজ শ্যামল ঘাসে ভরা উঠান চোখে পরে যেখানে উজ্জল সূর্য চকচক করছিল। ঐ উঠানের উপর একটি উজ্জল সূর্য চমকাচ্ছিল। আমাকে বলা হল, এটা ভারত (অর্থাৎ ইন্ডিয়া) সেখানে তিনি বিধ্বস্ত কিল্লাহ্ দেখলেন কিন্তু তাকে সেখানে যেতে দেয়া হল না। তাকে বলা হল, সেখানে যাওয়ার জন্য কিছু করতে হবে যার পর তাকে সেখানে যেতে দেয়া হবে।

এ স্বপ্ন দেখার প্রায় তিন চার সপ্তাহ পরে তাকে একজন ইমাম যিনি আহমদী ছিলেন না কিন্তু জামা'তে আহমদীয়ার মুবাল্লেগ সাহেবের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন। তিনি তাকে আহমদীয়া সেন্টারে আমাদের মুবাল্লেগ তাহের হায়াত সাহেবের কাছে নিয়ে আসেন। এখানে সেই মহিলাকে জামা'ত সম্বন্ধে জানানো হলে তিনি এ কথা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হন যে, ইমাম মাহদী ভারতবর্ষে এসেছেন আর স্বপ্নে আমাকে ভারতবর্ষেই উজ্জল সূর্য দেখানো হয়েছে। পরে তিনি আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় বয়আত করেন।

অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে এই ছিল কয়েকটি ঘটনা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

এখন সময় এসেছে যেন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ পায় এবং এ উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এসেছি। মুসলমানদের উচিত, যে নূর ও কল্যাণ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হচ্ছে তারা যেন তার সম্মান করে এবং আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। কেননা সঠিক সময়ে তাঁর সহায়তার হাত প্রশস্ত করেছেন এবং আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অঙ্গীকার অনুযায়ী বিপদের সময়ে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তারা যদি আল্লাহ্ তাআলার এ নেয়ামতের মূল্যায়ন না করে তবে আল্লাহ্ তাদের কোন পরওয়া করবেন না। তিনি তাঁর কাজ করে ছাড়বেন কিন্তু তাদের জন্য কেবল পরিতাপ থাকবে।' (লেকচার লুধিয়ানা, রূহানীখাজায়েন ২০তম খন্ড, পৃষ্ঠ-২৯০)

আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের হৃদয় প্রসারিত করুন এবং তারা যেন সত্যতা জানার জন্য তাদের খোদার দরবারে সত্যিকারের সাহায্য প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের ঈমানে দৃঢ়তা দান করুণ। (আমীন)

জুমুআর নামাযের পর এখনই আমি কয়েকটি জানাযার নামায গায়েব পড়াব; যাদের মধ্যে আমাদের একজন সিরিয়ার আহমদী বন্ধু রয়েছেন। তার নাম আহমদ বাকির সাহেব, তিনি ৫ মার্চ তারিখে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহে রাজিউন।

বাল্যকাল থেকেই মসজিদের সাথে তার যোগসূত্র ছিল কিন্তু তার সৎপ্রকৃতির জন্য খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মৌলভীরা যা বলে তা তারা নিজেরাই করে না। (অ-আহমদী মসজিদের সাথে যোগসূত্র ছিল) তাদের আমল এক আর তারা বলে আরেক। আল্লাহ্ তাআলা তাকে মৌলভীদের প্রতি বিতৃষ্ণা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এ দয়া করেছেন যে, তিনি দুনিয়াদারিতে লিপ্ত হন নি বরং আল্লাহ্ তাআলা তাকে জামাতে আহমদীয়ার সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তিনি জামাতের সম্বন্ধে ইস্তেখারা করেছেন। যে বিষয়ে আলোচনা এটাও সেটারই ধারাবহিকতা।

ইস্তেখারা করার পর তিনি স্বপ্নে দেখেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একজন তথাকথিত আহলে হাদিস মৌলভীর দিকে গেলেন এবং কাছে পৌঁছার সাথে সাথে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। হুযূর (আ.) এ মরহুম যুবকের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, এ সব মৌলভীকে তাড়িয়ে দিয়েছি। এ যুবক এ স্বপ্নের ফলে খুব প্রভাবিত হন এবং ১৫ জুলাই ২০০৯ইং তারিখে মাত্র ১৭ বছর বয়সে বয়আত করেন। তিনি ক্যান্সারের রোগী হওয়া সত্ত্বেও তার মাঝে তবলীগ করার খুব উৎসাহ ছিল। যে মৌলভী তাকে ধর্মান্তরিত করতে আসত তাদের কেউই তার সামনে দাঁড়াতে পারত না। তিনি অনেক সত্য স্বপ্ন দেখতেন। কয়েকজন বন্ধু বলেছেন, বর্তমানে সিরিয়াতে যে অবস্থা বিরাজ করছে সে সম্পর্কেও তিনি এক বছর পূর্বেই স্বপ্নের ভীত্তিতে কিছু বন্ধ-বান্ধবকে বলে ছিলেন। একটি তার জানাযা।

দ্বিতীয় জন সিরিয়ার তামিল রশীদ সাহেব। সিরিয়ার হামাস শহরের বিভিন্ন অলিগলিতে যে সব মিসিল, শ্লোগান এবং এলোপাথারি গোলাগুলি হচ্ছে, বিল্ডিং-এর ছাদ থেকেও মানুষ গুলি করছে ৮ এপ্রিল ২০১১ইং তারিখে এমনই এক গোলাগুলির সময় তামিল রশীদ সাহেব শহীদ হন। তার সম্পর্কে তার বড় ভাই বলেন, গোলাগুলির সময় আমি বাড়ির বাইরে ছিলাম তাই আমার ভাই গোলাগুলির শব্দ শুনে আমার ভাই আমাকে খোজার জন্য ঘর থেকে বাইরে বের হয় এবং কিছু দূর যেতেই সে আমাকে দেখতে পেয়ে দ্রুত বাড়ি যেতে বলে বাড়ি ফেরার জন্য সে ঘুরে দাড়ানোর পরই সে একটি গুলির লক্ষ্যস্থলে পরিনিত হয়। গুলিটি তার হৃদপিন্ডে লাগে এবং তৎক্ষণাত সে মারা যায়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহে রাজিউন। কিছু দিন পূর্বে তিনি বলেছেন, ১ এপ্রিল তারিখে আমি বিশেষ যে খুতবা দিয়েছিলাম সেখান থেকে তিনি সব বুঝে গিয়েছিলেন। হরতালে যোগ দেয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। যাই হোক বাইরে বের হয়েছিলেন এবং তখন যে গোলাগুলি হচ্ছিল তার লক্ষ্যস্থলে পরিনত হন।

অত্যন্ত হাসিখুশি ও প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং মানুষকে ভালবাসতেন। স্ত্রী ছাড়াও তার এক ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে। তার বয়স মাত্র ৩১ বছর ছিল। বয়আতের পূর্বে তিনি শেখ আব্দুল হাদী আলবানীর বয়আতকারী ছিলেন, যিনি দাবি করেন তিনি ইমাম মাহদী এবং হযরত ঈসা (আ.) দামেস্কে অবস্থিত তার মসজিদে অবতরণ করবেন। ওফাতে মসীহ্‌র যুক্তি- প্রমান শোনার পর তিনি ২০০৮ইং সালে বয়আত করে আহমদী হন।

তৃতীয় জানাযা সিরিয়ার মোহাম্মদ মোস্তফা সাহেবের। ইনি জুমার নামায পড়ার পর নিজের বাড়ির ছাদে আরাম করছিলেন এবং নিচের গলিতে লোকজন বিক্ষোপ করছি। তার ছেলে ছাদের রেলিং-এর কাছে গিয়ে নিচে দেখছিল তিনি গিয়েছিলেন তাকে পিছন দিকে সরিয়ে আনতে এমন সময়ই তার চোখে একটি গুলি লাগে এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহে রাজিউন।

তার জন্ম ১৯৭১ইং সালে এবং এয়ারপোর্টে চাকুরী করতেন। M.T.A.-এর মাধ্যমে তিনি আহমদীয়াতের সংবাদ পান। জানাশোনা করার পর ২০০৮ইং সালে বয়আত করেন। তার স্ত্রী অ-আহমদী কিন্তু আহমদীয়াতের সত্যতায় তিনি সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ তাআলা তাকেও আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য দান করুন। তার ছেলে, মেয়ে ছাড়াও তার দুই ভাই এবং আরো কয়েক ব্যক্তি জামাতের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, অনুগত, উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং খীলাফতের প্রতি তার খুব ভালবাসা ছিল। তার সন্তানদেরও একই অবস্থা। আল্লাহ্ তাআলা এদের সবাইকে মনোবল ও ধৈর্য দান করুন।

আরেকটি জানাযা আমাদের লুৎফর রহমান সাহেবের তিনি দির্ঘ দিন রোগভোগের পর গত ২৭ এপ্রিল তারিখে ইন্তেকাল করেন। তার ছিল প্রায় ৮০ বছর। ইনি মাওলানা আব্দুর রহমান আনোয়ার সাহেব যিনি হযরত খলীফাতু মসীহ্ সানী ও সালেসের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন তার বড় ছেলে ছিলেন। বরং তিনি তাহরীকে জাদীদের প্রাথমিক সদস্যদের একজন ছিলেন। তিনি ওয়াকফে জীন্দেগী ছিলেন এবং ফযলে উমর হাসপাতালে তিনি ডাঃ মির্যা মনোয়ার আহমদ সাহেবের সাথে ডিস্পেন্সার হিসেবে কাজ করতেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের সাথে তিনি আফ্রিকা ও ইউরোপে সফর করা সৌভাগ্যও লাভ করেছেন। খিলাফতের সাথে তার খুব গভীর সম্পর্ক ছিল। রাবওয়ার লোকদের সেবা করতেন। তিনি হযরত আম্মা জান হযরত উম্মুল মুমেনীন (রা.) এবং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ এবং হযরত খলীফাতু মসীহ্ সালেসের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। বরং তিনি হযরত আম্মা জান, হযরত খলীফাতু মসীহ্ সানী ও খলীফাতু মসীহ্ সালেসকে যে ইঞ্জেকশন দিতেন সেগুলোর সিরিঞ্জ ও সুই সযত্নে রেখে দিতেন। এগুলো তিনি তাবারক হিসেবে রেখে দিতেন। এখন তো আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় ফযলে উমর হাসপাতাল, গাইনী উইং ও হার্ট ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং চিকিৎসা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় রাবওয়াতে কেবল ডাঃ মির্যা মনোয়ার আহমদ সাহেব এবং ডাঃ হাসমতুল্লাহ্ সাহেবের ছেলে ডাঃ মোহাম্মদ আহমদ সাহেব ছিলেন। আর লুৎফর রহমান শাকের সাহেব একাই ল্যাবরেটরী চালাতেন। এছাড়াও মানুষের প্রয়োজন পরলেই বাড়িতে ডেকে নিয়ে যেতেন। চিকিৎসার সুযোগ যতটুকুই ছিল তিনি তা উত্তমরূপে দিতেন। ইনি রাবওয়া ফযলে উমর হাসপাতালের প্রাথমিক কর্মীদের একজন ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তার মর্যাদা উন্নিত করুন। তার স্ত্রী হযরত কাযী মোহাম্মদ রশীদ খান সাহেবের মেয়ে। মরহুম মূসী ছিলেন। বর্তমানে তিনি জার্মানীতে ছিলেন, তার ছেলেমেয়েরাও জার্মানীতে থাকে। খুব সম্ভব তাকে জানাযার জন্য রাবওয়া নিয়ে যাওয়া হবে। যাইহোক এখন আমি এ সব মরহুমদের জানাযা পড়াব। আল্লাহ্ তাআলা এদের সবার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন আহমদীয়াত ও খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখে। (আমীন)

অনুবাদঃ

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী

প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

হযরত উসমান আল-গনি ইবনে আফ্‌ফান (রা.)

মূলঃ আমের সাফির, লন্ডন, ইউকে
ভাষান্তরঃ সিকদার তাহের আহমদ

(১ম কিস্তি)

ভূমিকা

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর ইসলামের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন হযরত উসমান গনি ইবনে আফ্‌ফান (রা.)। অতুলনীয় বিনয়ী এই মহান ব্যক্তি মক্কার প্রভাবশালী উমাইয়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আর, ইসলাম গ্রহণের আগে তিনি অঢেল বিত্তশালী ব্যবসায়ীতে পরিণত হন। হযরত উমরের (রা.) মৃত্যুর পর একটি নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা খলিফা নির্বাচিত হন হযরত উসমান (রা.)।

তার অন্যতম অর্জন ছিল খিলাফত-প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্রীকৃত করা, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্রীকৃত করা এবং বিশেষভাবে, পবিত্র কুরআনের একটি অফিসিয়াল ভার্সন সংকলন করা। তার খিলাফতকালকে চিহ্নিত করা যায়, মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ ভয়াবহ গৃহযুদ্ধসমূহের এবং অস্থিরতা ও টানাপোড়েনের সময় হিসেবে। বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হাতে তার খুন হওয়ার ঘটনাটির দ্বারা ইসলামে প্রথম ফিতনার সূচনা ঘটে, ধারাবাহিক গৃহযুদ্ধের প্রাদুর্ভাব ঘটে, যা কিনা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের একতায় ফাঁটল ধরানোর হুমকী স্বরূপ ছিল।

পটভূমি

তার পূর্ণ নাম ছিল উসমান বিন আফ্‌ফান বিন আবু আল-আস বিন উমাইয়া বিন আবদ শামস বিন আবদ মন্নাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুররাহ বিন কা'ব বিন লুতবাই বিন গালিব। তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট-আত্মীয় ছিলেন। তার নানী ছিল মহানবী (সা.)-এর দাদার [আবদুল মুত্তালিব] আপন বোন। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে মহানবী (সা.)-এর ফুফাতো ভাই ছিলেন উসমান (রা.)।

হযরত উসমান (রা.) মাঝারি উচ্চতার ছিলেন। তার গায়ের রঙ ছিল ফর্সা। ঘন দাঁড়ি ও কোঁকড়ানো চুল, বড় বড় হাত-পা এবং খুবই সুন্দর দাঁত ছিল তার। সর্বোপরি, তার চেহারা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। সুন্দর কিংবা আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়াটা মানুষের জন্য খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। তবে এক্ষেত্রে হযরত উসমান (রা.) অনুপম ছিলেন। এটা মনে হতো যে, যারাই তার চেহারার প্রতি তাকাতো, তারা বিনা ব্যতিক্রমে একমত হতো যে, তারা ইতিপূর্বে কখনোই তার চেয়ে সুশ্রী কাউকে দেখেনি। আবদুল্লাহ ইবনে হাযম আল-মাযিনি নিম্নোক্ত কথা বলেছেন বলে জানা যায়:

"আমি উসমান ইবনে আফ্‌ফানকে দেখেছিলাম আর আমি কখনোই তার চেয়ে সুন্দর চেহারার কোনো পুরুষ কিংবা নারী দেখিনি।" [Suyuti p. 160]

এটা ছিল পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে হযরত উসমানের (রা.) প্রতি একটি অনুগ্রহ যে, তিনি এরকম অসাধারণ শারীরিক সৌন্দর্যের নেয়ামত লাভ করেছিলেন। যাহোক, আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে তার প্রতি এটিই একমাত্র অনুগ্রহ ছিল না। উসমানের (রা.) জীবন নিয়ে যখন কেউ চিন্তা করে, এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, তিনি অসংখ্য নেয়ামতের অধিকারী ছিলেন। আর সে-সব নেয়ামতও ছিল অনুপম ও অসামান্য। বিশেষত, তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলেন। এই ধরনের আরো একটি অকৃপণ দান হলো, হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর সঙ্গে তার অসাধারণ শারীরিক সাদৃশ্য। মহানবী (সা.)-এর কন্যা উম্মে কুলসুম (রা.) উসমানের (রা.) স্ত্রী ছিলেন। একবার হযরত আয়েশা (রা.) উম্মে কুলসুমকে (রা.) বলেছিলেন:

"সমস্ত পুরুষের মধ্যে তোমার স্বামীই একমাত্র ব্যক্তি যে কিনা তোমার দাদা ইবরাহীম এবং তোমার বাবা মুহাম্মদের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে।" [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৬১]

আরো একটি বর্ণনায় দেখা যায়, আবু হুরায়রাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন: "চারিত্রিক দিক থেকে আমার সঙ্গে আমার সাহাবীদের মধ্যে উসমান সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য রাখে।" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৬৪)

মহানবী (সা.) উসমানকে (রা.) অনেক উঁচু দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তিনি (সা.) তার দুই মেয়েকে উসমানের (রা.) সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াত লাভের আগে হযরত উসমানের (রা.) সঙ্গে প্রথমে তার (সা.) মেয়ে রুকাইয়াহ (রা.)-এর বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু, বদরের যুদ্ধের সময়ে রুকাইয়াহ (রা.) মারা যান। উসমানের জন্য এটি ছিল বিস্ময়কর সম্মান যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের (সা.) মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। এই সম্মান দ্বিগুণ হয়ে যায়, কারণ, রুকাইয়াহ (রা.)-এর মৃত্যুর পর মহানবী (সা.) তার দ্বিতীয় মেয়ে উম্মে কুলসুমকেও (রা.) হযরত উসমানের (রা.) সঙ্গে বিয়ে দেন। উহুদের যুদ্ধের পরপরই এই বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মহানবী (সা.) বলেন:

"উসমানের বিয়ে দাও। আমার যদি তৃতীয় [কন্যা]ও থাকতো, তাহলেও আমি তাকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতাম। আর, আল্লাহর ওহী ছাড়া আমি তার সঙ্গে বিয়ে দিতাম না।" [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৬৪]

এখেকে এই বিষয়টি পরিষ্কার যে, মহানবী (সা.) তার মেয়েদেরকে উসমানের (রা.) সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন শুধুমাত্র এই কারণে যে, আল্লাহ্ তাআলার ওহীর মাধ্যমে তাঁকে (সা.) বিয়ে দিতে বলা হয়েছিল। আলী (রা.) একবার শুনতে পেলেন যে, মহানবী (সা.) উসমানকে (রা.) বলছেন:

"এমনকি আমার যদি চল্লিশটি মেয়ে থাকতো,

তাদেরকে আমি তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতাম, একজনের পর একজনকে, যতদিন পর্যন্ত তাদের একজনও বাকি থাকতো।” [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৬৪]

মহানবী (সা.)-এর মেয়েদের মধ্য থেকে দু'জনকে বিয়ে করার অনুপম সৌভাগ্য লাভ করার কারণে উসমান (রা.) “জুন্নুরাইন” (দুটি নুরের অধিকারী) নামে পরিচিত ছিলেন। এটি খুবই সম্মানের বিষয় ছিল তার জন্য। একে তো, ইতিহাসে এ রকম কোন ঘটনার নজির দেখা যায় না। আর, এটি আল্লাহ্‌র একান্ত রহমতের জন্যই সম্ভব হয়েছিল। এছাড়া, এটি সেই লোকের জন্যই হয়েছিল যে কিনা অসাধারণভাবে আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ছিলেন। এই বিষয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন:

“আমার মামা হুসেইন আল-জুফি বলেছিলেন, ‘তুমি কি এটা বুঝতে পেরেছো কেন উসমানকে দুই নুরের অধিকারী বলা হয়?’ আমি বলেছিলাম, ‘না।’ তিনি বলেন, ‘ যখন থেকে আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করেছেন, উসমান ছাড়া আর কেউই কোন নবীর দু'টি মেয়েকে পায়নি, (আর কেউ পাবেও না) নির্ধারিত সময় না আসা পর্যন্ত।’”
[প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৫৯]

উসমান (রা.) এবং তার প্রথম স্ত্রী রুকাইয়াহ (রা.) খুবই সমমনোভাবাপন্ন দম্পতি ছিলেন। আর এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (সা.)ও স্বয়ং এটি মনে করতেন। উসমান ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেন:

“রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে উসমানের ঘরে পাঠালেন একটি পাত্র সহকারে, যার মধ্যে গোশ্‌ত ছিল। আমি ভিতরে গেলাম, সেখানে রুকাইয়াহ (রা.) বসে ছিলেন। আমি প্রথমে রুকাইয়াহর এবং পরে উসমানের চেহারার প্রতি তাকালাম এবং বারবার দেখতে লাগলাম। যখন আমি ফেরত এলাম, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি কি তাদের মাঝে গিয়েছিলে?’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ’। তিনি বললেন, ‘তুমি কি তাদের চেয়ে সুন্দর কোনো দম্পতি দেখেছো?’ আমি বললাম, ‘না, রাসূলুল্লাহ’।”
[প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৬১]

হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-এর মতো হযরত উসমানও (রা.) বণিক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধনী ছিলেন, এ যুগের বিচারে তাকে অনায়াসেই কোটিপতি বলা যায়। পুরো মক্কার ধনীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি। যাহোক, তিনি কখনোই গর্ব ও অহঙ্কার প্রদর্শন করেন নি। অজ্ঞতার যুগে, ইসলামী আইন-কানুন প্রবর্তিত হওয়ার আগেও তিনি কখনোই মদ্যপান করেন নি। মক্কার অন্যতম ক্ষমতাশালী পরিবারগুলোর একটির সন্তান ছিলেন তিনি। প্রখ্যাত ও প্রভাবশালী উমাইয়া উপগোত্রের সন্তান হওয়ার বিষয়টি পরবর্তীকালে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে মুসলমানদের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হয়েছে।

মুসলমান হিসেবে প্রাথমিক দিনগুলো

হযরত আবু বকর (রা.), হযরত খাদিজা (রা.) এবং হযরত যায়েদ (রা.)-এর পর হযরত উসমান (রা.) চতুর্থ ব্যক্তি হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকরের (রা.) মাধ্যমে তিনি যখন বয়আত গ্রহণ করেন তখন তার বয়স ছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর। অত্যন্ত ধনী হওয়া সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে তিনি উদার ও সহৃদয় ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। যেদিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন, তার পর থেকে প্রতি শুক্রবার তিনি একজন করে দাসকে মুক্ত করতেন। (History of Islam p. 280)

হযরত রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াতের প্রথম দিকে মক্কায় মুসলমানদের প্রতি জুলুম ও নিপীড়ন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। নন-মুসলিমদের হাতে মার খাওয়া ও নির্যাতিত হওয়ার বিষয়টি তখন মুসলমানদের জন্য স্বাভাবিক ও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। একটি ক্ষমতাশালী উপগোত্রের সন্তান হওয়ায় হযরত উসমান (রা.) তুলনামূলকভাবে আরাম-আয়েশ এবং বিলাসের মধ্যে বড় হয়েছিলেন। এরপরও তাকে অন্যান্য মুসলমানদের মতো কষ্ট-কাঠিন্যের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। তার চাচা হাকাম বিন আবি'ল আস তাকে বেঁধে রাখতো এবং নির্দয়ভাবে প্রহার করতো। কিন্তু, উসমান (রা.) পরিপূর্ণ স্থৈর্য প্রদর্শন করেছেন ও আত্মসংবরণ করেছেন এবং কোন ধরনের অসন্তুষ্টির ইঙ্গিতও প্রকাশ না করে এসব জুলুম-নির্যাতন বরদাশ্‌ত করেছেন তিনি। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৮০)

মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইবন আল-হারিস আত-তাইমি বর্ণনা করেন:

“যখন উসমান বিন আফ্‌ফান মুসলমান হলেন, তখন আল-হাকাম ইবন আবি'ল-আস ইবনে উমাইয়া তাকে ধরে রশি দিয়ে বাঁধলেন এবং বললেন, ‘তুমি কি তোমার বাপ-দাদার ধর্ম ছাড়তে চাও নতুন একটা ধর্মের খাতিরে? কসম খোদার, এসব পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়বো না।’ উসমান বলেন, ‘খোদার কসম, আমি এটা ছাড়বো না।’ স্বীয় বিশ্বাসের প্রতি উসমানের এই অবিচলতা দেখে আল-হাকাম তাকে ছেড়ে দিলেন।” [Suyuti p. 161]

মক্কাবাসীদের অত্যাচার যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন মহানবী (সা.) তার অনুসারীদেরকে জড়ো করলেন এবং বললেন, পশ্চিমে সমুদ্রের ওপারে এমন একটি দেশ আছে যেখানে খোদার ইবাদতের কারণে কারো প্রতি অত্যাচার করা হয় না। সেদেশে একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্ রাজত্ব করেন। তোমরা হিজরত করে সে দেশেই চলে যাও। হয়তো এতে করে তোমাদের নিরাপত্তার পথ খুলে যাবে। অতএব, কিছু সংখ্যক মুসলিম পুরুষ ও নারী এবং ছোট ছেলে-মেয়ে তাঁর (সা.) নির্দেশ অনুসারে আবিসিনিয়ার [বর্তমান ইথিওপিয়া] দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। হিজরতকারী এই ছোট দলটির মধ্যে হযরত উসমানও (রা.) ছিলেন। তিনি দু'টি হিজরতেই অংশ নিয়েছিলেন। প্রথমত, আবিসিনিয়ায় (Life of Muhammad) এবং পরবর্তীতে মদিনায়। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন,

“সপরিবারে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের মধ্যে উসমান ইবনে আফ্‌ফান প্রথম ছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, ‘আল্লাহ্ তাদের দু'জনের সঙ্গী হন। লুত-এর পর [নবী লুত (আ.)] উসমানই প্রথম ব্যক্তি, যে কিনা আল্লাহ্‌র খাতিরে সপরিবারে হিজরত করলো’।” [Suyuti p. 161]

মক্কাবাসী যখন জানতে পারলো একদল মুসলিম শরণার্থী তাদের নিজ শহর ছেড়ে ভেগে গেছে, তখন তারা তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। মুসলমানদেরকে তাদের হাতে হস্তান্তরিত করার বিষয়ে আবিসিনিয়ার বাদশাহকে রাজি করাতে ব্যর্থ হওয়ার পর, মক্কার লোকেরা আবিসিনিয়ায় একটি গুজব রটালো যে, মক্কার সব লোক মুসলমান হয়ে গেছে। তথাকথিত শয়তানী পংক্তিমালার (Satanic Verses) ঘটনা, যা-নিয়ে প্রাচ্যবিদরা অনেক হৈচৈ করে থাকে, সেই সময়ে সংঘটিত হয় বলে বলা হয়ে থাকে। কিছু মুসলমান তখন মক্কায় ফেরত এসে জানতে পারলো এই ঘটনা মিথ্যা ছিল। (Life of Muhammad) হযরত উসমানও (রা.) এই দলে ছিলেন।

(চলবে)

প্রসঙ্গ : মিরাজ ও ইসরা

শাহ আলম খান

মিরাজ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা। তাঁর জীবনের সমস্ত ঘটনার মধ্যে মি'রাজ নিয়ে যত বিতর্কের উদ্ভব হয়েছিল অন্য কোন ব্যাপারে ততটা হয় নাই। তবে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই এটি সম্মিলিত সাহাবায়ে কেরামগণের ইজমা। আল্লাহ্ তাআলা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বলে ঘোষণা করেন। তাই ইসলাম তথা মহানবীর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ স্বরূপ মি'রাজের মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অবতারণা করেন। তিনি শ্রেষ্ঠ নবীকে তার একান্ত সান্নিধ্যে ডেকে নিয়ে নিখিল বিশ্বের নিগুঢ় রহস্য অবগত করালেন যা অন্য কোন নবীর সৌভাগ্য হয়নি।

মি'রাজ আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-নিবিড় উর্ধ্বগমন, চড়া বা উপরের দিকে উঠা, এ কারণে সিঁড়িকেও মি'রাজ বলা হয়। যে রাত্রে নবী করীম (সা.) উর্ধ্বজগতের সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে সপ্ত আকাশ পার হয়ে সিদরাতুল মুনতাহা নামক সীমারেখা এবং উর্ধ্ব হতে উর্ধ্বতম জগৎসমূহ পরিভ্রমণ করেছিলেন ঐ রাত্রিকে মি'রাজ রাত্রি বলা হয়।

এই চাঞ্চল্যকর পর্বটি কবে, কোন সালে সংঘটিত হয়েছিল, এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পার্থক্য শুনা যায়। আল কুরআনের আয়াত সমূহ ও সংশ্লিষ্ট হাদীস সমূহ একত্রিত করে নিরপেক্ষ ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হলে এ কথাটি সুন্দর ও সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল নবীজি (সা.)-এর নবুওয়াতের পঞ্চম বৎসরের রজব মাসে। যখন মুসলমানদের উপর মক্কাবাসীদের উপর অত্যাচার নির্যাতন চরম আকার ধারণ করলো, এক পর্যায়ে নবীজি (সা.) সাহাবীগণকে ডেকে বললেন, পশ্চিমে সমুদ্রের উপরে এমন একটি দেশ আছে যে দেশে খোদার ইবাদতের কারণে কারো প্রতি অত্যাচার করা হয় না, ধর্ম পরিবর্তনের কারণে কাউকে হত্যা করা হয় না। সেদেশে এক ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্ রাজত্ব করেন। তোমরা হিজরত করে সে দেশেই চলে যাও। হয়তো এতে করে তোমাদের নিরাপত্তার পথ খুলে যাবে।

আমরা জানি সেই সৌভাগ্যশালী দেশটির নাম আবিসিনিয়া বর্তমান নাম ইথিওপিয়া। এভাবে মুহাম্মদ (সা.) মক্কার কাফির মুশরিকদের অত্যাচারে মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে সান্তনা দিয়ে সমাজকে নতুন ভাবে সংস্কারের জন্য একটি পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা সহ অভয়বাণী প্রদান করেন।

মি'রাজ আধ্যাত্মিকভাবে স্বপ্নযোগে হয়েছিল নাকি স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল এর পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথা শুনা যায়। আবার কেউ কেউ মি'রাজ ও ইসরা এই ২টি ভিন্ন সময়ের ঘটনাকে একই সময়ের ঘটনা বলে বর্ণনা করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মি'রাজ সম্পর্কে–

হযরত আনাস ইবনে মা'লেক (রা.) বর্ণনা করেন হযরত রাসূল করীম (সা.) নিজে বলেছেন–একদা আমার নিকট বুরাক আনীত হল, উহা সাদা রং এর দীর্ঘাকৃতি বিশিষ্ট একটি প্রাণী, যা দেখতে গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চেয়ে ছোট। এমন দ্রুতগামী যে, এর প্রত্যেকটি "কদম" নিজের দৃষ্টির সীমা রেখা শেষ প্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়।

অত:পর আমাকে এর উপর আরোহন করানো হলো তারপর জিবরাঈল আমাকে সঙ্গে নিয়ে (উর্ধ্বলোকে) যাত্রা করলেন। নিকটতম আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন, জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সা.)। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তখন বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতই না উত্তম। অত:পর দরজা খুলে দেয়া হল। যখন আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে দেখতে পেলাম এক লোক এমনভাবে বসা আছেন। যাঁর ডানে ও বামে মানুষের প্রতিবিম্ব বা রূহ সমূহ রয়েছে।

তিনি যখন ডান দিকে তাকান তখন হাসেন আবার বামদিকে তাকান তখন কেঁদে ফেলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে বলল, সত্য নবী ও যোগ্য সন্তানের জন্য খোশ আমদেদ। একথা শ্রবণে আমি জিবরাঈলকে বললাম, ইনি কে? তিনি উত্তর দিলেন, ইনি হযরত আদম (আ.)। আর তাঁর ডানে ও বামে যে রূহগুলো দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো তাঁর আওলাদের রূহ সমূহ। তাঁর ডান দিকে অবস্থিত রূহগুলো বেহেশতবাসীদের আর বাম দিকে অবস্থিত রূহগুলো দোযখবাসীদের। তাই তিনি (আ.) ডান দিকে নজর করলে হাসেন আর বাম দিকে নজর করলে কেঁদে ফেলেন।

অত:পর আমাকে নিয়ে জিবরাঈল (আ.) দ্বিতীয় আকাশে আরোহন করেন, দ্বিতীয় আকাশে পৌছে দরজা খুলতে বললে পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করা হয়। সেখানে দেখতে পেলাম ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ.)-কে। জিবরাঈল (আ.) তাদের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। এমনি ভাবে জিবরাঈল (আ.) উর্ধ্বে আরোহন কালে তৃতীয় আকাশে পরিচয় হল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে। চতুর্থ আকাশে পরিচয় হলো হযরত ইদ্রিস (আ.)-এর সাথে। পঞ্চম আকাশে হযরত হারুন (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত হল। ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত ও পরিচয় হল। তারপর আল-বাইতুল মা'মুর আমার সামনে পেশ করা হল। এরপর আমার সামনে হাজির করা হল একপাত্র মদ, এক পাত্র দুধ ও এক পাত্র মধু। এর মধ্য থেকে আমি দুধ বেছে নিলাম ও তা পান করলাম। তখন জিবরাঈল বললেন, আপনি ও আপনার উম্মত যে (ইসলামরূপী) স্বভাবজাত ধর্মের অনুসারী এটা তারই নিদর্শন।

হযরত আনাস ইবনে মা'লেক (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন, তারপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত উঠানো হল। জিবরাঈল বললেন, এটিই সিদরাতুল মুনতাহা। আমি দেখতে পেলাম (সিদরার মূল হতে নির্গত) চারটি নহর। দু'টো নহর অপ্রকাশ্য ও দু'টো প্রকাশ্য। আমি জিবরাঈলকে এ নহরের তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করায় বললেন, অপ্রকাশ্য নহর দু'টো হল জান্নাতে প্রবাহিত দু'টি কর্মধারা। আর প্রকাশ্য দুটো হল নীলনদ ও ফুরাত নদী।

সিদরাতুল মুনতাহায় এসে জিবরাঈল এবং বোরাকের গতি থেমে গেল। জিবরাঈল বললেন, আমাদের আর সামনে অগ্রসর হবার শক্তি নেই। তখন আমি একা একাই রফ রফ নামক বাহনে আরোহন করে আরো সামনে অগ্রসর হয়ে আল্লাহ্ তাআলার খাস আরশ্ মহল্লায় গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য, সান্নিধ্য, দীদার লাভ করার পর আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলাম। ফলে আল্লাহ্ তাআলার করুণা ও শুভেচ্ছা লাভ করলাম এবং সর্বোপরি পুরস্কার হিসেবে দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায দেয়া হল। অত:পর আমি ফিরে চললাম। হযরত মূসা (আ.)-এর সম্মুখ দিয়ে যাবার সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনাকে কি করতে আদেশ করা হয়েছে? বললাম, দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায়ের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায়ে সক্ষম হবে না। আল্লাহ্‌র কসম! আপনার পূর্বে আমি (ইসরাঈলী) লোকদেরকে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বনী ইসরাঈলীদের হেদায়াতের জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছি। অতএব (সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই আপনাকে বলেছি) আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের পক্ষে (নামায) আরো হ্রাস করার জন্য আবেদন করুন। তখন আমি ফিরে গেলাম এবং ঐভাবে প্রার্থনা জানালে আল্লাহ্ তাআলা আমার উপর হতে দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। তারপর আমি মূসার নিকট ফিরে এলাম। তিনি এবারও অনুরূপ কথা বললেন, ফলে আমি পুনরায় (আল্লাহ্‌র কাছে) ফিরে গেলাম, ফরিয়াদ করলাম, এবার আরো দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন।

এভাবে গিয়ে আবেদন করে করে কমিয়ে সর্বশেষ আমাকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হয়েছে। অত:পর মূসার কাছে ফিরে এলে মূসা (আ.) শুনে বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়েও সক্ষম হবে না, আপনি আবার রবের কাছে ফিরে যান এবং নামায কমিয়ে দেয়ার প্রর্থনা জানান। নবীজি (সা.) বললেন, আমি আমার রবের কাছে (কর্তব্য হ্রাসের জন্য) এত অধিকবার প্রার্থনা জানিয়েছি যে, (পুনরায় প্রার্থনা জানাতে) এখন লজ্জাবোধ করছি। বরঞ্চ আমি এতটুকুতেই সন্তুষ্ট ও আনুগত্য প্রকাশ করছি। আমি যখন মূসাকে অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হলাম তখন জনৈক আহ্বানকারী আমাকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, আমার অবশ্য পালনীয় আদেশটি আমি জারি করে দিলাম এবং আমার বান্দাদের জন্য আদেশটি মুক্ত করে দিলাম। (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম শরীফ)।

উল্লেখ্য যে, মি'রাজের ঘটনাটি বুখারী শরীফে, মুসলিম শরীফে ও অন্যান্য কিতাবে হুবহু বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় না। বর্ণনার কিছু তারতম্য দেখা যায়। এর আসল কারণ হলো প্রথমত: যে রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মি'রাজ হয়েছিল, পরদিন ফজর নামাযের পরে উপস্থিত সাহাবীগণের সামনে তিনি (সা.) মি'রাজের সুদীর্ঘ ঘটনাটি প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। এই সময়ে উপস্থিত মাত্র কয়েক জন সাহাবী ঘটনাটি বিস্তারিত ভাবে শুনেছেন।

দ্বিতীয়ত: ঘটনাটির দীর্ঘতার কারণে অনেকেই শুনার পরে সেগুলিকে যথাযথ ভাবে ঠিক রেখে অন্যান্য সাহাবীদের কাছে বর্ণনা দিতে পারেন নি। বরং আগের কথা পরে আর পরের কথা আগে বলে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয়ত: নবীজি (সা.) ঘটনাটির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন–এখানে যা বলা হয়েছে ঐখানে তা নিয়ে কোন প্রকার আলোচনা করেননি।

চতুর্থত: নবীজি (সা.) মি'রাজের কোন একটি বিশেষ অংশকে কমাবার উদ্দেশ্যে ঘটনার আগেকার কথাগুলোকে কাট-ছাট করে প্রসঙ্গত: সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন। আসল উদ্দেশ্যটি বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করে দিয়েছেন। প্রথমত: সাহাবাদের অনেকেই বিভিন্ন দিকের প্রশ্নাবলী করেছেন। হুযুর (সা.) প্রশ্নকারী সাহাবীর অবস্থাভেদে প্রশ্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যার কারণে মি'রাজের একটি ঘটনা কিন্তু সাহাবীদের বর্ণনায় হুবহু মিল পাওয়া যায় না। মতানৈক্য ও বিতর্কের এটিও একটি কারণ।

আরেকটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য যেমন মি'রাজ ও ইসরা কি একই ঘটনা? একই রাত্রে ঘটেছিল? না, মি'রাজ ও ইসরা একই ঘটনা নয় এবং একই রাত্রে ঘটেনি। নিম্নে জ্ঞান পিপাসু পাঠকগণের জন্য মি'রাজ ও ইসরা ঘটনাদ্বয়ের গবেষণালব্ধ তুলনা প্রদর্শন করা হল :-

মি'রাজের ঘটনা

১। মি'রাজের বর্ণনা রয়েছে সূরা নাজমে ৮-১৮নং আয়াতে। ২। মি'রাজ হয়েছিল আগে, নবুওয়াতের ৫ম বৎসরে রজব মাসে। ৩। মি'রাজ হয় কা'বা শরীফ হতে আরশুল্লাহ্ পর্যন্ত সফর। অত:পর ফিরে আসেন। ৪। মি'রাজের রাতে নবী (সা.) কা'বার হাতিম অংশে শুয়ে ছিলেন। ৫। সূরা নাজমে বর্ণনা নবী (সা.)-এর মি'রাজ বাইতুল মোকাদ্দাসে যাবার বর্ণনা নাই কিন্তু আকাশে যাবার কথা আছে। ৬। মি'রাজে নামায ফরজ হবার বর্ণনা আছে। ৭। মি'রাজে আপ্যায়নে তিনটি পেয়ালা পেশ করা হয়। ৮। মি'রাজে মাত্র ৮ জন নবীর সাথে সাক্ষাত এবং জিবরাঈল (আ.) তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

ইসরার ঘটনা

১। ইসরার বর্ণনা রয়েছে সূরা বনী ইসরাঈলের ২নং আয়াতে। ২। ইসরা হয়েছিল পরে, নবুওয়াতের ১১/১২ তম বৎসরে যখন বিবি খাদিজা (রা.) ইন্তেকাল করেছেন। ৩। ইসরা, মসজিদ হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফর। অত:পর ফিরে আসেন। ৪। ইসরার রাতে নবী (সা.) উম্মে হানির ঘরে শুয়ে ছিলেন। তার কাছে শুধু জেরুযালেমে সফরের বর্ণনা বলেছেন ৭ জন সাহাবী একই বর্ণনা দিয়েছেন। ৫। সূরা বনী ইসরাঈলে আকাশ যাবার উল্লেখ নেই কিন্তু বায়তুল মোকাদ্দাস যাবার কথা উল্লেখ আছে। ৬। ইসরার ঘটনায় নামায ফরজের কথা নেই। ৭। ইসরার বর্ণনায় আপ্যায়নের কথা উল্লেখ নেই। ৮। ইসরাতে পূর্ববর্তী যামানার সকল নবীদের সাথে (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার) সাক্ষাত পরিচয় হয়। নবীজির ইমামতিতে নামায আদায় করে। অপরদিকে মি'রাজ ঐ সকল নবীদের মধ্য হতে ৮ জনের সাথে বিভিন্ন আসমানে সাক্ষাত হয়। কিন্তু তিনি (সা.) তাঁদের চিনতে পারেন নাই। জিবরাঈল (আ.) পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, মি'রাজ ও ইসরা যদি একই রাতে হয়ে থাকে তাহলে কিছুক্ষণ আগে যাদের সাথে পরিচয় হল তাদেরকে তিনি (সা.) চিনতে পারলেন না কেন? একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তাভাবনা করলে মি'রাজ ও ইসরার যে আলাদা, ভিন্ন সময়ের ঘটনা তা উপরোক্ত তুলনা হতে স্পষ্ট হয়ে যায়।

মি'রাজের প্রকৃতি: মূল মি'রাজ সম্পর্কে কারো কোন দ্বিমত নেই। তবে এর প্রকৃতি নিয়ে সম্মানিত সাহাবায়ে আনহুম, ইমাম ও ধর্ম তত্ত্ববিধগণের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। অনেকের মতে মি'রাজ ও ইসরা আধ্যাত্মিকভাবে হয়েছিল আবার অনেকের মতে স্বশরীরে হয়েছিল। নিম্নে আধ্যাত্মিকভাবে মি'রাজ ও ইসরা হবার পক্ষে দলিল পেশ করা হল :-

১নং দলিল: সূরা নাজমে আছে–তাঁর (সা.)-এর হৃদয় এই দৃশ্য দেখেছিল (সূরা নাজম ১২ আয়াত)

২নং দলিল: সূরা বনী ইসরাঈলে আছে–আমরা তোমাকে (মুহাম্মদ) যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলাম একে এবং কুরআনে বর্ণিত সেই অভিশপ্ত বৃক্ষটিকেও আমরা কেবল মানুষের জন্য পরীক্ষার কারণ করেছিলাম। ১৭ : ৩১ আয়াত।

৩নং দলিল: সূরা আনআমে আছে–কোন দৃষ্টিশক্তি তাঁকে (আল্লাহ্) দেখতে পারে না, অথচ তিনিই সব দৃষ্টিকে দেখে থাকেন, তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী এবং সব অবগত। (৬ : ১০৪) অনেকের মতে মি'রাজ নবীজি (সা.) আল্লাহ্ তাআলাকে স্বচক্ষে দেখে ছিলেন এ আয়াত স্বশরীরে মি'রাজের ধারণাকে খন্ডন করে যে, মানুষের চর্মচক্ষু দ্বারা তাঁকে দেখা যায় না।

৪নং দলিল: মি'রাজের ঘটনায় দেখা যায়–নবীজি (সা.)-কে বেহেশ্ত ও দোযখ দেখানো হয়েছে। অথচ নবীজি (সা.) বলছেন, "কোন চক্ষু তা (বেহেশ্তের আর্শিবাদসমূহ) দেখেনি, কোন কর্ণ তাদের সঠিক বর্ণনা শুনেনি এমনকি মানুষের মন ঐ সব ঐশী আশীর্বাদের ধারণা পর্যন্ত করতে পারে না। (বুখারী, কিতাবুল বা'দল খালক)

উপরোক্ত বর্ণনা মতে স্বশরীরে মি'রাজ হলে বেহেশ্ত দোযাখ তিনি দেখেন নি!

৫ম দলিল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্কে অন্তরের চোখে দেখেছিলেন। মুসলিম শরীফ হাদীস নং ৩৪৪।

বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দ! এতক্ষণ আমরা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে মি'রাজ ও ইসরা যে আধ্যাত্মিকভাবে হয়েছিল তাঁর অকাট্য দলিল প্রমাণ দেখালাম। এবার যুক্তিমূলক প্রমাণ উপস্থাপন করা হচ্ছে :-

হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর "মিরাজ ও ইসরা" যে আধ্যাত্মিকভাবে হয়েছিল তা রাসূল (সা.)-এর মি'রাজ ও ইসরার বর্ণিত ঘটনায় বর্ণিত দৃশ্যাবলী হতে স্পষ্ট বুঝা যায়। যেমন প্রথমত: "বোরাক" নামক বাহনটিতে চড়ে নবীজি (সা.) মি'রাজে গিয়ে ঐ রাতেই মক্কায় ফিরে আসেন। পরদিন সকালে মক্কাবাসী কি মুসলমান কি মুশরিক কেউই ঐ দ্রুতগামী বাহন জন্তুটিকে চোখে দেখেন নি কেন? এজন্য যে মি'রাজ আধ্যাত্মিকভাবে হয়েছিল। তাহলে বোরাকের বর্ণনার তাৎপর্য কি তা জানতে হবে।

হযরত রাসূল করীম (সা.) যে কত অল্প সময়ের মধ্যে এই আধ্যাত্মিক সফর সম্পন্ন করেছিলেন সেটা বুঝা যায় শুভ্র বাহন বোরাকের ব্যাপারটির দিকে তাকালে। তিনি (সা.) বিদ্যুতের গতিতে মি'রাজ বা মহা আধ্যাত্মিক ভ্রমণে গিয়েছিলেন বলেই এই বাহনটির নাম 'বোরাক'। বিদ্যুৎকে আরবী ভাষায় 'বারক' বলা হয়। 'বারক' শব্দ হতে বোরাক হয়েছে। অথচ অনেকেই ভুল করে মনে করে যে, আকাশ হতে বুঝি কোন অদ্ভুত জন্তু সেদিন নেমে এসেছিল মক্কায়। আর রাসূলে করীম (সা.) এই জন্তুটির পিঠে চড়ে বসেছিলেন আমাদের মাঝে প্রচলিত রূপকথার গল্পের পংখীরাজ ঘোড়ার মত ঐ জন্তুটি ছুটেছিল আকাশ পানে। সাত আসমান পেরিয়ে আল্লাহ্ যেখানে কুরসী পেতে বসে আছেন একেবারে তাঁর সামনে গিয়ে থামলো এই জন্তুটা! আসলে তা নয়! মহান আল্লাহ্ তাআলার অবস্থান একই সময়ে সর্বত্র। তিনি যদি আকাশের ওপর বসে থাকেন তবে কি পৃথিবীতে নেই? মহাশূন্যের উপর কোন নির্দিষ্ট জায়গাতেই আল্লাহ্ সীমাবদ্ধ নহেন।

অনেকে লিখেছেন, বোরাকের মুখ মেয়েদের মত এবং দেহ ঘোড়ার মত। এখানে যদি তাই হয় তবে এর তাৎপর্য বুঝতে হবে। তাহলো মানুষের নফসকে

ঘোড়ার সাথে তুলনা করা যায় এবং দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ হলো মেয়েদের মত। যদি এই ২টি বিষয়কেই মানুষ আয়ত্বে আনতে পারে অর্থাৎ যদি মানুষ নফসরূপী ঘোড়ার লাগাম মজবুত ভাবে ধরে আয়ত্বে রাখতে পারে তবে সে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য পেতে পারে। মহানবী (সা.) দুনিয়াতে থেকেও নফসের ঘোড়াকে কাবু করে রেখেছিলেন। যেমন তিনি (সা.) বলেছেন, "আমার শয়তান মুসলমান হয়ে গেছে। সে আমাকে খারাপ কাজের দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে না।" সেজন্য দুনিয়া তাঁর কাছে মেয়ে মানুষের আকারে দেখা দিলেও তিনি (সা.) দুনিয়ার দিকে (ভোগ বিলাস) ফিরেও তাকান নি।

দ্বিতীয়ত: প্রথম আকাশ হতে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত ৮ জন নবীর সাথে সাক্ষাত পরিচয় হয়েছে। আমরা জানি ঐ ৮ জন নবী সবাই ইন্তেকাল করেছেন শত শত বছর পূর্বে। জীবিত ও মৃত এক নহে। সুতরাং স্বশরীরে মৃতদের সাথে সাক্ষাত হয় না কেবল আধ্যাত্মিকভাবে স্বপ্নযোগেই সম্ভব। তাছাড়া আকাশে ভ্রমণেরও তাৎপর্য আছে। তাহল:- মি'রাজের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, অন্য সব নবীর তুলনায় মহানবী (সা.)-এর স্থান অনেক উর্ধ্বে। শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে তাঁর অবস্থান উন্নতির সবচে' শীর্ষে। মানুষ যতটা উন্নতি করা সম্ভব তার সবটাই তিনি (সা.) করেছিলেন। উর্ধ্বগতির সর্বশেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছে ছিলেন বলেই তিনি শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌছেছেন। মহানবীর মি'রাজের বর্ণনা হতে দেখা যায় তা নিম্নে ছকে তুলে ধরা হল :-

সিদরাতুল মুনতাহা	হযরত মুহাম্মদ (সা.)
৭ম আকাশ	হযরত ইব্রাহীম (আ.)
৬ষ্ঠ আকাশ	হযরত মূসা (আ.)
৫ম আকাশ	হযরত হারুন (আ.)
৪র্থ আকাশ	হযরত ইদ্রিস (আ.)
৩য় আকাশ	হযরত ইউসুফ (আ.)
২য় আকাশ	হযরত ঈসা (আ.) ও ইয়াহইয়া (আ.)
১ম আকাশ	হযরত আদম (আ.)

এখানে একেকটা আকাশ বলতে আধ্যাত্মিক উন্নতির একেকটা সোপান বুঝানো হয়েছে। ছকে এটা লক্ষণীয় যে সব নবীই নবীজি (সা.)-এর নীচে অবস্থান করছেন।

পবিত্র কুরআনের সূরা নাজমের ৮নং আয়াতে মহান আল্লাহ্‌ তাআলা মি'রাজের বর্ণনায় বলেছেন, "আমার সাথে রাসূল করীম (সা.)-এর সান্নিধ্য এমনভাবে হয়েছিল (যেমন) অত:পর সে দুই ধনুকের একতন্ত্রী হয়ে গেল অথবা উহা হতে আরও নিকটতর হয়ে গেল।" (৫৩ : ১০

মহানবী (সা.) মহান আল্লাহ্‌ তাআলার মধ্যে নিজেকে এমনভাবে বিলীন করে দিলেন যে, তিনি (সা.) স্বয়ং যেন তারই প্রতিচ্ছবি হয়ে গিয়েছিলেন। অপরদিকে তিনি প্রেমভরা হৃদয়াবেগ ও সহানুভূতি পূর্ণ মঙ্গল কামনায় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে মানবের নিকট এমনভাবে অবতরণ করলেন যে তাঁর (সা.) সত্তায় উলুহিয়্যৎ ও ইনসানিয়্যত (ঈশ্বরত্ব ও মানবত্ব) একাকার হয়ে গেল।

তৃতীয়ত: সিদরাতুল মুনতাহা দেখেছিলেন। সিদরা আরবী শব্দ এর অর্থ; কুল গাছ, 'মুনতাহা' অর্থ শেষ প্রান্ত।

মি'রাজ যদি বাস্তবিক ধরে নেয়া হয় তাহলে নবীজি (সা.) যে কুল গাছটি দেখেছিলেন সেটির বয়স কত? তখন যদি চারাগাছ মাত্র রোপন করা হয়ে থাকে তাহলে বর্তমানে কুল বৃক্ষটির বয়স হবে প্রায় ১৬ শত বছর। ১৬ শত বছরের গাছটি কত বিরাট আকার ধারন করবে? এর শিকড়, ডাল-পালা কোথা থেকে কোথা প্রসারিত হচ্ছে। গাছের জীবিত থাকার জন্য পানির প্রয়োজন! সবই কুদরতে চালিয়ে দিলে হয় না। পানি ছাড়া কুল গাছকে বাঁচানো যাচ্ছে না। সুতরাং কুলবৃক্ষের তাৎপর্য জানা প্রয়োজন, তাহল:- কুলবৃক্ষের পাতা যেমন পচন থেকে মৃতদেহকে রক্ষা করে, তেমনি মহানবী (সা.)-এর শিক্ষাও দুনিয়ার সব মানুষকে ধ্বংস ও পচে যাওয়া থেকে, নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে। মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যে অপূর্ব জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা অনন্তকাল পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথের পথিকদের শান্তি দেবে এবং সুস্থ রাখবে। সিদরাতুল মুনতাহা অর্থ হল, এ স্থানটি স্রষ্টা ও সৃষ্টির জগতের মধ্যবর্তী সীমারেখারূপে বিদ্যমান। এখানে এসে সকল জ্ঞানীর জ্ঞান শেষ হয়ে যায়। তারপর যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ জানে না। কুল গাছ বা এর ডাল দিয়ে সীমানায় বেড়া দেয়া হয় যেন ভেতরে কেউ প্রবেশ করতে না পারে। একথা বোঝানোর জন্যই পবিত্র কুরআনে মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌ আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বশেষ স্তরের প্রান্তবর্তী কুলবৃক্ষের কথা বলেছেন। সীদরাতুল মুনতাহায় পৌছে মুহাম্মদ (সা.) দেখেছিলেন সিদরা বা কুলবৃক্ষের মূল হতে প্রবাহিত ২টি নহর। হযরত জিবরাঈল (আ.) এ নহর ২টির তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বলে ছিলেন প্রকাশ্য ২টি নহর হল মিসরের নীলনদ ও বাগদাদের ফুরাত নদী।

প্রিয় পাঠক! কোথায় নীল নদ আর কোথায় ফুরাত নদী? এই বিরাট দূরত্বের নদী ২টিকে তিনি (সা.) একটি গাছের গোড়া হতে নির্গত হতে দেখেছেন! কাজেই বুঝা যাচ্ছে নবীজি (সা.) আধ্যাত্মিকভাবেই এই সফর করেছিলেন।

চতুর্থত: জেরুযালেমস্থ বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদে ১ লক্ষ/২ লক্ষ ২৪ হাজার নবীগণকে নিয়ে বাজামাত নামায আদায় করার স্থান নেই। মসজিদটি ছোট আকারের। তবে রূহানীভাবে লক্ষ লক্ষ লোক এখানে নামায পড়া সম্ভব। এ ঘটনা হতে বুঝা যায় ইসরা দৈহিকভাবে হয়নি, আধ্যাত্মিক ভাবে হয়েছিল। তাছাড়া পূর্বে নবীরা তো সবাই ইন্তেকাল করেছেন। মৃত মানুষরাতো জীবিত হয়ে আমাদের মতো দেহ নিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু স্বপ্নে আমরাও মৃত মানুষদের দেখতে পারি, কথা বলতে পারি!!

মি'রাজের গুরুত্ব; মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মি'রাজের ঘটনায় আমরা পরিস্কার বুঝতে পারি যে, তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম ও সর্বশেষ শিখরে উন্নীত হয়ে শ্রেষ্ঠত্বের সর্বশেষ উন্নতি প্রাপ্ত নবী হয়েছেন। আর অন্য সব নবীই ছিলেন তাঁর অনুগত ও তার চেয়ে কম মর্যাদার। তাঁর (সা.) উন্নতি এতই বেশী যে সেখানে কোন নবী এমনকি কোন ফিরিশ্‌তা পর্যন্ত ঘেঁসতে পারে না।

অতএব এই মহানবীকে (সা.) যারা যথাযথ ভাবে অনুসরণ করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এবং যারা আল্লাহ্‌ ও এই রাসূলের আনুগত্য করবে তারা ঐ সকল লোকদের মধ্যে শামিল হবে যাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা পুরস্কার দান করেছেন। অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ, ও সালেহগণের মধ্যে। আর এরাই সাথী হিসেবে উত্তম।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! দেখুন, আমাদের নবীর কি বিরাট মর্যাদা! তাঁকে আনুগত্য করলে নবী পর্যন্ত হওয়া যায়। আর এটা আল্লাহ্‌র স্পষ্ট ঘোষণা। কারো সাধ্য নেই আমাদের মহানবী (সা.)-কে দেয়া আল্লাহ্‌র এই বিশেষ রহমত ও নেয়ামতকে বন্ধ করার। মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াতের 'মোহর' বা 'খাতাম' ছাড়া অন্য কোন নবীর নবুওয়াতই সত্য বলে সাব্যস্ত হয় না। এখানেই খাতামান নাবীঈন বা নবীদের মোহর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব। তাই একথা সব সময় মনে রাখতে হবে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ করে তার উম্মতের মধ্যে কেউ যদি আর নবী হতে না পারে তাতে এই মহানবীর জন্য মর্যাদা হানি হয়। উপরন্তু তাঁকে অনুসরণ করে যদি কেউ নবী পর্যন্ত হতে পারে তবে তাতে তাঁরই মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আর এই মর্যাদা স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁকে (সা.) দিয়েছেন। কেউই এ মর্যাদা কেড়ে নিতে পারবে না। অতএব মি'রাজের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বশেষ চূড়ায় উঠেছিলেন আমাদের নবী, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা গেল মি'রাজ ও ইসরা দু'টি একই ঘটনা নয়। একেই রাত্রে ঘটেনি। এই ২টি পৃথক পৃথক সময়ের ঘটনা। মি'রাজের ঘটনা সূরা নাজমে আছে। যা তাঁর নবুওয়াতের ৫ম সালে রজব মাসের কোন এক রাত্রে সংঘটিত হয়েছিল আর ইসরার ঘটনা কুরআনের সূরা বনী ইসরাঈলে আছে যা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কাজীবনের শেষ বর্ষে নবুওয়াতের ১১/১২ সালে হয়েছিল। ২টি ঘটনার মধ্যে প্রায় ৬/৭ বৎসরের ব্যবধান। আর মি'রাজ ও ইসরা ২টি ঘটনাই আধ্যাত্মিক ভ্রমণ ছিল। এই ভ্রমণদ্বয় দৈহিকভাবে ঘটেনি।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, খাতামান নাবীঈন ছিলেন। মি'রাজ ও ইসরার ঘটনা তারই অকাট্য প্রমাণ বহন করে।

তথ্যপঞ্জি:

১। আল কুরআন মজীদ, সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা নাজম। ২। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ। ৩। ইসলামী ষ্টাডিজ ডিগ্রী। ৪। বিশ্বনবী ও চার খলীফার জীবনী। ৫। আঁধার দেশে আলোর মাণিক।

যরাথুস্ত্র ও তার ধর্ম

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রবল বাধাবিপত্তি সত্বেও যরাথুস্ত্র সত্যের প্রচার জারি রাখতে নিজেকে উৎসর্গ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তাঁর বিবেচনায়, আদর্শের জন্য কাজ করার মধ্যেই পুরস্কার বিদ্যমান রয়েছে :

'হে মাজদা আমি অবশ্যই তোমার বার্তা প্রচার করবো, কারণ এটা বিজ্ঞজনকে এ খবর দেয় যে, মিথ্যাশ্রয়ীদের জন্যে মন্দ ভাগ্য অপেক্ষা করছে, অপর পক্ষে সত্যবাদীদের জন্য রয়েছে স্বর্গ; সেই ব্যক্তিই সুখী ও জ্ঞানী হবে, যে জ্ঞানীদের কাছে তোমার পবিত্র বাণী ছড়িয়ে দেয়'। (ইয়াসনা ৫০ : ৮)

নিজ অনুসারীদের মধ্যে যরাথুস্ত্র এক ভ্রাতৃসংঘ কায়েম করেছিলেন, যার অভ্যন্তরে কয়েকটি বিভাগ ছিল। শিষ্যরা ছিল তিন পদের, যথা-যায়েতু (মূল নীতিতে বলবান), ভেরেযেনা (সহকর্মী) এয়ারেমনা (বন্ধু)।

ফ্রাসাস্ত্রা নামীয় এক শিষ্যের (যে রাজা ভিস্তাস্পার বিচারালয়ে উচ্চপদে সমাসীন ছিল) ভগ্নি হ্যাভোবির সাথে যরাথুস্ত্রের বিয়ে হয়। তার সর্বকনিষ্ঠ কন্যা পারুশিস্তা তার চাচা জ্যামাস্পাকে (রাজা ভিস্তাস্পার মুখ্য উপদেষ্টা) বিয়ে করে, যিনি অনুগতদের প্রথম জামাত প্রতিষ্ঠা করেন।

যরাথুস্ত্রের তিন পুত্র সমাজে তিনটি শ্রেণী : যাজক, যোদ্ধা, ও কৃষক-এর প্রবর্তন ও প্রতিনিধিত্ব করে।

সবশেষে সাতাত্তর বছর বয়সে এবং ওহী প্রাপ্তির সাতচল্লিশ বছর পর যখন মাসদেস্নিজাম ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তখন তাঁর শাহাদতের ঘটনা ঘটে। কথিত আছে যে, যরাথুস্ত্র এক ব্যক্তির হিংস্সাত্মক আক্রমণে মৃত্যুবরণ করেন। কেউ বলে, ব্যাকটিরিয়ার (বলখ) নিজস্ব উপাসনা-গৃহে প্রার্থনারত অবস্থায় ধর্মের এক শত্রু তুরবারাতুর কর্তৃক তিনি নিহত হন।

অন্য এক উৎস বর্ণনা করে যে, তিনি অন্যান্য যাজকদের সাথে তুরানিদের দ্বারা নিহত হয়েছেন, যারা বল্‌খ শহরে হামলা চালিয়ে 'নুস আজর' মন্দির ধ্বংস করে, যার মধ্যে অবস্থিত অগ্নি বেদিতে তিনি কাজ করছিলেন। তার ভুয়সী প্রশংসাকারী গ্রীকগণ বলেছেন যে, স্বর্গ থেকে আগত এক বজ্রাঘাত বা অগ্নিশিখা দ্বারা তাঁর মৃত্যু ঘটে।

পবিত্র গ্রন্থসমূহ

কেবলমাত্র একটি পবিত্র গ্রন্থ 'আভেস্তা'-র বর্ণনা পাওয়া যায়, যেটার মাত্র একটি টুকরা বিদ্যমান আছে। এটা পূর্ব-ইরানীয় স্থানিক ভাষায় লিখা যরাথুস্ত্রীয় পরম্পরাগত মতবাদ এবং তাবারি ও মাসউদি নামক দু'জন মুসলমান লেখক বর্ণনা করেন যে, সম্পূর্ণ 'আভেস্তা'-টি বার হাজার ষাঁড়/গাভীর চামড়ার উপর স্বর্ণের কালিতে লিখা হয়েছিল এবং পার্সেলিসের ইস্তাখর বা দিঝ-ই-নিফিস্ত কোষাগারে রাখা অবস্থায় মহামতি আলেকজান্ডারের আক্রমণের সময় পুড়ে যায় এবং এর দ্বিতীয় অনুলিপিটি এথেনস্-এ নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে এটাকে গ্রীক ভাষায় তরজমা করা হয়। যরাথুস্ত্র ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের উক্তিগুলো বংশ পরম্পরায় খুব সম্ভব মৌখিক ভাবেই চালমান হয়ে থাকবে।

এমতাবস্থায় এবং বিজয় পরবর্তী কালে উদ্ভুত বিশৃঙ্খলার ফলে মৌখিক পরম্পরার অনেকটাই অবশ্য হারিয়ে গেছে। কথিত আছে যে, আভেস্তার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ মানুষের স্মৃতিতে অবশিষ্ট ছিল।

এটাও বর্ণিত আছে যে, উপর্যুক্ত অবস্থা ছাড়াও যরাথুস্ত্রীয় সাহিত্য আরও দু'টো অপুরণীয় ক্ষতির শিকার হয়। প্রথমটি সপ্তম শতাব্দিতে আরবদের বিজয় দ্বারা এবং পরেরটি দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন মোগল বাদশাহ্‌গণ ক্ষমতা দখল করেন সেই সাসানীয় আমলে (যরাথুস্ত্রীয়দের ক্ষমতার শেষ ভাগে) এক তৃতীয়াংশের বেশী ধর্মীয় সাহিত্য ধ্বংস করা হয়েছিল।

পরম্পরাগত মতবাদ বলে যে, আভেস্তা একুশ নাস্ক-এ (খন্ডে) গঠিত ছিল। ওগুলোর সারাংশ পাহ্‌লভী গ্রন্থ ডেনকার্টে দেখা যায়, যেটার বর্তমান আকার নবম শতাব্দী থেকে শুরু হয়। নাস্ক-এর এক-তৃতীয়াংশ বিদ্যমান আছে, যা-ও আকারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

পার্শিয়ানদের দ্বারা গ্রীকদের উচ্ছেদের পর যরাথুস্ত্রাবাদ পুনরুজ্জীবিত হয়। রাজা ভলগা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আভেস্তার টুকরোগুলো সংগ্রহ করার নির্দেশ দেয়। ২২৪ খৃষ্টাব্দে সাসানীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আরদেসিরের উর্ধতন যাজক তানসার কর্তৃক এ কাজ সম্পন্ন হয়। একই সময়ে পাহ্‌লভীতে আভেস্তার অনুবাদের কাজ চলতে থাকে এবং এর সাথে টীকা সংযুক্ত করা হয়, যা একত্রে জেনদাভেস্তা নামে পরিচিতি লাভ করে। তানসার আভেস্তাকে তিন খন্ডে পুনর্বিন্যস্ত করেন : গাসানিক (গ্যাথিক বা ধর্মীয় স্তবগান), হাধা মানসরিক (আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব শিক্ষার সংযোগ) এবং দাতিক (আইন)।

বিদ্যমান আভেস্তাটি পাঁচ খন্ডে বিভক্ত:–

১। ইয়াসনা (শ্রদ্ধা) : এটা সৃষ্টিকর্তা, ওহী, চিরন্তন বিধি, পছন্দের স্বাধীনতা, জীবনের উদ্দেশ্য, আত্মার অনৈতিকতা, পরিণতি-আইন এবং বিশ্বের পূর্ণর্নবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর রয়েছে বাহাত্তরটি হাইতি (অধ্যায়) এবং এটা দু'টি গাথার অন্তর্ভুক্ত।

গাথা (স্বর্গীয় স্তবগান)গুলো হচ্ছে আভেস্তার অতি পবিত্র ও প্রমানিক অংশ। ওগুলো আসল মাজদাইজম অর্থাৎ সেই ধর্ম, যেটা প্রাচ্য ইরানের ওহীর সময় থেকে প্রকাশ্যে ব্যক্ত ও অনুশীলিত হয়ে আসছিল। এটা ছিল একামেনীয় শাসন কালের প্রথম ভাগে সেই এলাকারও ধর্ম, এবং যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, গাথাগুলো মাজদাইজমকে চিরকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং যরাথুস্ত্র-ভিন্ন অন্য কাউকেই পরোক্ষ ভাবে নবী বলে ঘোষণা করে না। যাহোক, এ গ্রন্থ সাওশায়ান্ত (যেসব ধামিক লোক বিশ্বের উন্নয়নের জন্যে কাজ করে) এর কথা বলে। যরাথুস্ত্র সহ হাজার হাজার লোককে সাওশায়ান্ত হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সোশিও-রূপে অপরিণত আভেস্তায় সাওশায়ান্তকে পছন্দিত রক্ষাকর্তা হিসেবে দেখা হয়েছে। ইব্রাহীমি ধর্মে পন্ডিতগণ মসীহ্ বা মাহ্‌দী বুঝাতে সাওশায়ান্তের নাম ব্যবহার করেছেন।

১। ক) ইয়াসনা-র অধ্যায় ২৮ থেকে ৩৪ এবং ৪৩ থেকে ৫৩ হচ্ছে আসল গাথা। এগুলো আভেস্তার আদি অংশ, যিনা আভেস্তার অবশিষ্টাংশের ভাষা আলাদা। এগুলো কোন নির্দেশ নয়, বরং প্রয়াশ: সরাসরি খোদার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত ইন্দো-ইউরোপীয় কালের অতি প্রাচীন আবেগপূর্ণ প্রত্যাদিষ্ট কাব্যিক-উক্তি বিশেষ। এই সতেরটি মহান স্তবগান বা গজল যরাথুস্ত্র কর্তৃক রচিত হয়েছিল এবং যাকে আভেস্তার নায়েলকৃত

অংশ বলা হয়ে থাকে। সম্প্রদায়টি কর্তৃক বিশ্বস্ততার সাথে এগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে।

খ) গাথার সাত অধ্যায়-কিতাব ইয়াসনার অধ্যায় ৩৫ থেকে ৪২ জুড়ে এর অবস্থান। এগুলো যরাথুস্ত্রের মৃত্যুর পর তার শিষ্যদের দ্বারা গদ্যে রচিত হয়েছে।

২। ইয়াস্ত, যার অর্থ হলো শ্রদ্ধাস্পদ। এগুলো ইয়াযাতাস (অর্থাৎ পূজনীয়) এর প্রশংসায় রচিত। অধিকাংশ ইয়াযাতাস গাথার মৌলিক উপাদান নয়। ঘটনাক্রমে ম্যাগীগণ (যরাথুস্ত্রপূর্ব ধর্মের অনুসারী) নতুন ধর্ম গ্রহণ করে তাতে ইয়াযতাজ আকারে কতিপয় দেবতার প্রচলন করে সফলকাম হয়।

৩। ভিস্প্রেদ, যার অর্থ হলো উৎসবাদি। এর চব্বিশটি অধ্যায় আছে, যা ছয়টি ঋতু ভিত্তিক ধন্যবাদ জ্ঞাপক উৎসব গাহানবারস-এর সাথে সম্পর্কিত।

৪। ভেন্দিদাদ, যার অর্থ হলো দৈত্য এবং মিথ্যা দেবতার বিরুদ্ধে প্রণীত আইন, যা মূলতঃ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের আইন নিয়ে গঠিত।

৫। খোরদেহ্‌ আভেস্তা, এটা হলো দ্বিভাষিক, এবং এটা দৈনিক প্রার্থনাসমূহের ধারক, যার কিছু অংশ পার্সীতে রচিত। ওগুলো সাসানীয় ও তদুত্তুর-কালের প্রার্থনা সমূহের প্রতিনিধিত্ব করে।

আভেস্তার অবশিষ্টাংশকে তরুণ আভেস্তা বলা হয়। অন্যান্য শাখাগুলো থেকে এটা আলাদা এবং বিভিন্ন সময়ে পূর্ব-ইউরোপীয় ভাষায় যরাথুস্ত্রের অনেক পরে এটা রচনা করা হয়েছিল। যরাথুস্ত্রের শিক্ষা বংশপরম্পরায় মৌখিক ভাবে প্রচারিত হয়ে সাসানীয় রাজত্ব চলাকালে মধ্যপার্সীয় ভাষায়, যাকে পাহ্‌লভি বলে, লিখিত আকারে প্রকাশ পায়।

পাহ্‌লভি গ্রন্থাদি হচ্ছে আভেস্তীয় উৎস সমূহের পরের সংস্করণ, এবং যেগুলো গাঁথাসমূহের সারমর্মের ব্যাখ্যা ও যরাথুস্ত্রীয় মতবাদ অধ্যয়নে অমূল্য সমাধান দান করে। অধিকাংশ পাহলভি মূল-পাঠ পান্ডিত্য ও দামী দার্শনিক সুগন্ধযুক্ত শিক্ষায় ভরপুর। তাদের মধ্যে কয়েকটি ইরানে ইসলামী (শিয়া) দর্শনকে প্রভাবিত করেছে বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে, কিন্তু সেগুলো গোঁড়া যরাথুস্ত্রবাদের প্রতিনিধিত্ব করে না। এসব গ্রন্থের অধিকাংশই সাসানীয়দের পতনের অল্প কয়েক শতাব্দী পরে এক প্রতিকুল পরিবেশে রচিত হয়, যেগুলোতে বড়জোর তাদের লেখকদের বিশ্বাস ও মতামতের প্রতিফলন ঘটেছে।

পাহ্‌লভি মূলপাঠ দুভাগে বিভক্ত :

১। আভেস্তিয় মূলপাঠের পাহ্‌লভি বর্ণনা পাহ্‌লভি ইয়াসনা, পাহ্‌লভি ভিস্প্রেদ, এবং পাহলভি ইয়াস্ত। এগুলো আভেস্তিয় মূলপাঠের অনুরূপ ধর্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থ।

২। আভেস্তিয় ও পাহ্‌লভী, পাহ্‌লভি মূলপাঠের মিশ্রণ, যেমন আফ্রিনি-দাহমান এবং খাঁটি পাহ্‌লভি গ্রন্থাদি

এগুলো ধর্মটিকে কেন্দ্র করে দর্শন, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং আইন সম্পর্কিত বিষয়াদির সাথে সংশ্লিষ্ট। এদের আধ্যায়ে সমূহ গোঁড়া যরাথুস্ত্রীয় শিক্ষা বিবর্জিত। কতিপয় পাহলভি গ্রন্থ হচ্ছে নিম্নরূপ :

১। দিনকার্দ : ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, আইনি ও চিকিৎসা-বিদ্যা বিষয়ক তথ্যাদির এক কৌতুহল-প্রদ সংগ্রহ।

২। ম্যাতিকান-ই-হিযার দেদিস্তান–সাসানীয় যুগের কতিপয় আইনজ্ঞের ব্যক্তিগত আইন ও বিচারালয় সংক্রান্ত মতের উপর এক প্রবন্ধ।

৩। শিকান্দ শুমানি ভিজার: এটা ধর্মের দর্শনের উপর পান্ডিত্যপুর্ণ এক গ্রন্থ, যার মধ্যে স্থূল কাঠামোয় যরাথুস্ত্রবাদ ও এর সাথে সম্পর্কিত মতবাদে ভালো ও মন্দের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটাতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের কতিপয় বিশ্বাসের খন্ডন করা হয়েছে।

৪। বুন্দাহিসন: এটা হচ্ছে উপর্যুক্ত শ্রেণীর আরেকটি গ্রন্থ। এটাতে সৃষ্টির উৎপত্তি ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৫। মিনোক-ই-খার্দ: এটা কতিপয় প্রাসঙ্গিক লোক-কাহিনী সম্বলিত নীতি-বিজ্ঞানের একটি গ্রন্থ।

৬। শায়াস্ত-লা-শায়াস্ত, বা পাহলভি রিভায়াত: এ গ্রন্থে পাপের সমস্যাদি, শবদেহের পরিচালনা, অপবিত্রতা এবং পবিত্রতা অর্জনের উপায় বর্ণনা করা হয়েছে।

৭। আর্দা ভিরাফ নামেহ্‌:- এটা এক উর্ধতন যাজকের স্বর্গ ও নরক পরিদর্শনের সাহিত্যিক ও কল্পিত বিবরণ, যার সাথে দান্তের স্বর্গীয় হাস্যরসাত্মক নাটকের কিছুটা মিল রয়েছে, কিন্তু তা তিন শতাব্দী পূর্বের লেখা।

৮। বেইম্যান ইয়াস্ত: এ গ্রন্থে রয়েছে যরাথুস্ত্রের বিজয় ও সাজা ভোগ এবং (তথাকথিত) মুসলমানদের পীড়াদায়ক আচরণের বিবরণ।

যরাথুস্ত্রের শিক্ষাসমূহ :

মানব সত্তায় যরাথুস্ত্র ছিলেন একাধারে এক মহাজ্ঞানী, যাজক, শিক্ষক, এবং একজন নবী। তিনি ছিলেন এক নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং সে' যুগের বাসিন্দা, যখন জড়োপাসনা ও প্রকৃতি-পূজার নানাবিধ পদ্ধতি সর্বব্যাপী বিদ্যমান ছিল, যাদের মধ্যে সূর্য-সংক্রান্ত পূজা-পদ্ধতি ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। গ্রীক ইতিহাসবেত্তাদের মতে, উপাসনার পুরোনো পদ্ধতির পরিবর্তনের পর তিনি বহুবিধ এবং অদ্ভুত সব মতবাদের প্রবর্তন করলেন এবং কোন মধ্যস্থ ব্যক্তির মাধ্যমে পরোক্ষ সান্নিধ্য লাভের প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে প্রজ্ঞা, নৈতিকতা, এবং ভালোবাসা দ্বারা খোদার সাথে ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের ওকালতি করলেন। রাজকুমার ও যাজক মন্ডলীকে তুষ্ট করার প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে মানবতার উন্নতির জন্য তিনি স্বার্থহীন নিষ্ঠা ও কুরবানীর কথা প্রচার করলেন। যেহেতু যরাথুস্ত্র প্রচলিত ধর্ম ও এর রীতিগুলো অগ্রাহ্য করলেন, সেহেতু পশ্চিম-ইরানের ম্যাগীর (ম্যাগ অর্থ মহৎ) যাজকদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী তাঁর ও তাঁর মিশনের বিরোধিতা করে বসলো। কেবলমাত্র রাজা ভিস্তাস্পার মন জয় করার পরেই তিনি কৃতকার্য হতে, তার বিচারালয়ে প্রবেশ করতে এবং ওহীর মাধ্যমে পবিত্র প্রভু আহুরা মাজদা কর্তৃক তার উপর অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারলেন।

যরাথুস্ত্রের শিক্ষার প্রথম মতবাদ বিজ্ঞ-প্রভু আহুরা মাজদাকে কেন্দ্র করে, কারণ, তার মতে তিনিই হচ্ছেন একমাত্র সর্বোচ্চ খোদা, উপাসনার যোগ্য। তিনি নিজে গভীর ও আন্তরিক শ্রদ্ধা, সুচিন্তা, সৎবচন এবং নেক কাজের মাধ্যমে কেবল দু'হাত উঁচু করার সহজ আনুষ্ঠানিকতা পালন করে খোদার এবাদত করেছেন এবং তার অনুসারীদেরকে এ পদ্ধতি অবলম্বন করেই এবাদত করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তিনি নিজে বিশ্বাস করতেন আর তার অনুসারীদেরকেও এটা বিশ্বাস করতে প্রভাবিত করে গেছেন যে, খোদাই হলেন স্বর্গ ও মর্তের সৃষ্টিকর্তা, অর্থাৎ জড় ও আধ্যাত্মিক জগতের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই হচ্ছেন আলো ও আঁধারের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনকারী, সার্বভৌম আইন দাতা, প্রকৃতির কেন্দ্র, নৈতিক শৃঙ্খলার সূচনাকারী, এবং সমগ্র দুনিয়ার বিচারক। তিনি ছয় অথবা সাতজন 'আমেশা স্পেন্তা' চিরজীবি হিতসাধনকারী দ্বারা বেষ্টিত (যেভাবে আভেস্তায় বর্ণিত হয়েছে)। এদের সৃষ্টিকর্তা ও পিতা হচ্ছেন আহুরা মাজদা। তাঁর নিজ চেতনা থেকে এরা বিচ্ছেদযোগ্য এবং এরা হচ্ছে :

স্পেন্টা মাইন্যু অর্থাৎ 'পবিত্র আত্মা', আশা ভাহিস্তা অর্থাৎ 'ন্যায় বিচার ও সত্য', বহু মানাহ্‌ অর্থাৎ 'ন্যায়পরায়ণ চিন্তা এবং আরমায়তি বা স্পেন্টা আরমায়তি অর্থাৎ 'নিষ্ঠা'। এ দলের অন্য তিনটি সত্তা, যেগুলোকে আহুরা মাজদার গুণ হিসেবে

প্রকাশ করা হয়ে থাকে, সেগুলো নিম্নরূপ :

খাশথ্রা ভায়র্য়া অর্থাৎ 'কাম্য রাজ্য', ভাউরভাতাত অর্থাৎ 'সামগ্রিকতা' এবং আমেরেতাত অর্থাৎ 'নীতিহীনতা'। যরাথুস্ত্রের শিক্ষায় দ্বিতীয় যে শিক্ষাটি সংযুক্ত হয়েছে, তা হচ্ছে বিশ্ব ভাল ও মন্দ, সত্য ও মিথ্যা, পবিত্রাত্মা ও বিনাশী আত্মার মধ্যে বিভক্ত। উভয় আত্মাকেই স্পষ্টভাবে পাশাপাশি অবস্থানকারী যমজ আত্মা বলা হয়ে থাকে। যরাথুস্ত্র তাঁর অনুসারীদেরকে এ মর্মে সতর্ক করেন যে, তার জীবনই সর্বোৎকৃষ্ট, যে সততার নীতির সাথে মিল রেখে কাজ করে, যদিও প্রত্যেক পর্যায়ে নিজ পছন্দকেও অগ্রাধিকার দিতে হয়। যরাথুস্ত্রের নীতি ভাল বনাম মন্দের নৈতিক দ্বৈতবাদকে আকর্ষণ করেনি কিন্তু ব্যক্তির পছন্দের মধ্যে ভালকে, সত্যকে পছন্দ করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং পবিত্রাত্মার আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তৃতীয়ত: বিজ্ঞ প্রভুর সৃষ্টিকে মুক্তভাবে অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে তারা কোনটি বেছে নেবে, সেটা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। এটা আধ্যাত্মিক ও মানবীয়, উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য।

আংরা মাইন্যু: ধ্বংসাত্মক আত্মা, মানুষকে প্রদত্ত ইচ্ছার স্বাধীনতাকে বাগে এনে খারাপ কাজ করতে আগ্রহ জাগায়। একই ভাবে প্রাচীন ঈশ্বর দেবগণ, যাদের পূজার সাথে হিংস্রতার মিশ্রণ রয়েছে, তারা যরাথুস্ত্র কর্তৃক মন্দ অস্তিত্ব বলে বিবেচিত।

যরাথুস্ত্রের শিক্ষার চতুর্থ নির্দেশ হচ্ছে, যেহেতু একজন মানুষ নিজ ইচ্ছা মোতাবেক তার কার্যাদি পরিচালনা করার এখতিয়ার রাখে, সেহেতু তার চূড়ান্ত ভাগ্যের জন্যে সে নিজেই দায়ী। ভালো কাজের জন্যে সে চিরন্তন পুরস্কার অর্জন করে। পাপাচারী নিজ বিবেক দ্বারাও অত্যন্ত নিন্দিত হয় এবং ন্যায়পরায়ণ খোদা কর্তৃক দোজখের চিরন্তন শাস্তি পেয়ে থাকে, যা হচ্ছে সবচে মন্দ জীবন।

পঞ্চম নির্দেশ হলো, সত্যের বাহ্যিক প্রতীক হচ্ছে আগুন, যার উপস্থিতিতেই এ ধর্মের অনুসারীদের উচিত যাবতীয় ধর্মীয়-উৎসবাদি পরিচালনা করা। অগ্নি-বেদীই হচ্ছে যরাথুস্ত্রবাদীদের ধর্মবিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু। আগুন ও গলিত ধাতুর কঠোর পরীক্ষা দ্বারা যরাথুস্ত্র তার বার্তার সত্যতা প্রতিষ্ঠা করেন এবং কেবল আগুন ও গলিত-ধাতুই হবে সেই বস্তু, যা দ্বারা আখেরাতে মানবতা নির্ধারণ করা হবে।

যরাথুস্ত্রবাদীরা সাধারণত: অগ্নি-উপাসক বলে পরিচিত এবং প্রকৃতিগত ভাবেই এরূপ নামকরণে তারা বিরক্ত হয়, কারণ যরাথুস্ত্র নিজে এ উপাদানকে শ্রদ্ধা করতেন, যা সত্যের শক্তির অধিকারী। 'গাথা' সমূহে 'স্বর্গীয় অগ্নি'কে বিচার দিবসে পরীক্ষার উপায় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা বলে যে, এটাকে প্রাকৃতিক আগুন হিসেবে নেয়া যাবেনা, বরং এটা হচ্ছে 'আধ্যত্মিক আগুন' এবং 'অভ্যন্তরীণ আগুন' যা প্রত্যেক ধার্মিক যরাথুস্ত্রির অন্তর আলোকিত করে। এরূপ বর্ণিত আছে যে, যরাথুস্ত্র বহু বছর ধরে সমগ্র ইরানীয় মালভূমি ভ্রমণ করেন এবং আলোর জীবন-কাহিনী প্রচার করে মানুষকে আলো দ্বারা অন্ধকারকে এবং মঙ্গল দ্বারা অন্ধকারকে দূর করতে আহ্বান জানান, আহুরা মাজদার উপাসনা এবং আংরা মায়ন্যু অর্থাৎ অন্ধকারের প্রভুকে পরাস্ত করার কাজে তাঁকে সাহায্য করতে আহ্বান জানান। তিনি সর্বদা নিজের সাথে এক 'আগুনের ঘনক্ষেত্র' (অজ্ঞাত চরিত্র) বহন করতেন। মৃত্যুর সময় তিনি মাজদার উপাসনার এক উৎস রেখে যান, যার প্রত্যেকটার সাথেই চিরন্তন আগুনের একটি করে পাত্র ছিল। এমতাবস্থায় যরাথুস্ত্রবাদীদেরকে অগ্নি উপাসক বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

সবশেষে যরাথুস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থ থেকে কতিপয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। এসব অংশ যরাথুস্ত্র মতবাদের সাথে যুক্ত পন্ডিত-জনাব তারা পরেওয়ালা কর্তৃক অনুদিত।

'হে মাজদা আমি অবশ্যই তোমাকে সর্বোচ্চ সদাশয় মিতব্যয়ি বলে বিশ্বাস করি, কারণ, আমি তোমাকে সব সৃষ্টিরই মৌলিক কারণ হিসেবে দেখতে পাই, কারণ তোমার নিখুঁত বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত তুমি ভালো কর্মের জন্যে সমুচিত ভালো, মন্দ কর্মের জন্যে সমুচিত মন্দ প্রতিদান দেবে'। (ইয়াসনা ৪৬ : ৫)

'তোমার কোন্ ভক্তরা আমাদেরকে এটা শিক্ষা দেবে':

সেই যোগ্য কে হে, কর্মের পবিত্র বিচারক, সত্যের প্রভু, জীবনের রহস্য, যিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির পরিকল্পনা সমূহ প্রকাশ করেন, আহ্বান করো। আমরা এসব রহস্যের সমাধান করতে ভালোবাসার মাধ্যমে সংগ্রাম করবো। (ইয়াসনা ৪৬ : ৯)

প্রারম্ভে দু'টো রূহ ছিল, দু'টোই স্বত:স্ফূর্তভাবে সক্রিয় ছিল, আর এগুলো চিন্তা, কথা ও কর্মে ছিল শুভ ও অশুভ। এ দুটোর মধ্যে জ্ঞানীদের পছন্দ ছিল সঠিক, ভালো হও, নিকৃষ্ট হয়ো না। (ইয়াসনা ৩০ : ৩)

হে মরণশীলরা, সেসব নির্দেশ মোতাবেক আচরণ করো :–

'যেসব নির্দেশ সুখ এবং দুঃখের নিমিত্তে বিজ্ঞপ্রভু দান করেছেন, কদাচারীদের জন্যে দীর্ঘ সাজা, আর সত্যাশ্রয়ীদের জন্যে পরম সুখ, ন্যায়পরায়ণদের জন্য পরবর্তীতে চির-মুক্তির আনন্দ।' (ইয়াসনা ৩০ : ১১)

'ঐ সব লোক, যারা জীবিত ছিল, এখনও জীবিত আছে এবং যারা এখনো জন্মগ্রহণ করেনি, দু'টোর মধ্যে সেই পুরস্কারটি লাভ করবে, যেটা তকদীরে লেখা থাকবে!'

'সদাচারীর আত্মাটি চিরদিন মৃত্যুহীনতার মধ্যে আনন্দে থাকবে, কিন্তু মিথ্যাবাদীর আত্মা অবশ্যই আজাবের মধ্যে থাকবে। আর এসব আইন আহুরা মাজদা তার সর্বভৌম ক্ষমতার মাধ্যমে জারি করেছেন।' (ইয়াসনা ৪৫ : ৭)

'তোমার চিরন্তন বিধান মতে মানুষ তার সব চিন্তা, কথা ও কাজের ফল ভোগ করবে, খারাপ কাজের খারাপ ফল আর ভালো কাজের ভালো ফল আর এটাই হচ্ছে তকদীর।' (ইয়াসনা ৪৩ : ৫)

'সত্য কথা শুনে যে ব্যক্তি সেমতে জীবন যাপন করবে, সে হবে আত্মার আরোগ্যকারী জ্ঞান-সম্পন্ন প্রভু: আর তার কাজ হলো আহুরার সত্য-শিক্ষা বাগ্মিতার সাথে প্রচার করা ও তা দ্বারা প্রত্যয় সৃষ্টি করতে সমর্থ হওয়া; হে মাজদা, প্রত্যেক মানুষের প্রতি অর্পিত দায়িত্বকে তাদের মাঝে তোমার আগুন জ্বালিয়ে স্পষ্ট করো।' (ইয়াসনা ৩১ : ৯)

'হে মাজদা, আমি অবশ্যই তোমাকে সর্বশক্তিমান দাতা হিসেবে বিবেচনা করবো! কারণ তুমি তোমার দানকারী হাত দ্বারা যুগপৎ ভাবে ন্যয়পরায়ণ (সৎ) ও দুষ্টকে সাহায্য করে থাক। হে মাজদা, তোমার আগুনের দ্বীপ্তিময় শিখা ও সত্যাশ্রিত শক্তির মাধ্যমে আমি মঙ্গলের তেজ প্রাপ্ত হয়েছি।' (ইয়াসনা ৪৩ : ৪) 'হে মাজদা আহুরা, তোমার পবিত্র আত্মা এর মাধ্যমেই আমাদের নিয়তি মোহর করে, তোমার আগুন আমাদের প্রাপ্য পুরস্কার প্রদান করবে, যেভাবে শক্তি ও আশা ভিতরে-ভিতরেই সঞ্চারিত হয়, অন্বেষণকারীদের পদক্ষেপকে তোমার পথে পরিচালিত করা হবে।' (ইয়াসনা ৪৭ : ৬)

সত্য ও মিথ্য উভয় দলকেই মাজদা স্বর্গীয় জ্বলন্ত অগ্নির পরীক্ষায় ফেলেন; এই অগ্নিবৎ পরীক্ষা তাদের অন্তরাত্মাকে উদোম করে ফেলে, যেভাবে প্রত্যেকের জন্য প্রকাশিত রায় নির্দেশ করে; মিথ্যাশ্রয়ীর জন্যে রয়েছে পূর্ণ-নৈরাশ্য আর সত্যাশ্রয়ী লাভ করবে অফুরন্ত দান। (ইয়াসনা ৫১ : ৯)

তথ্যসূত্র : রিভিউ অব রিলিজিওনস, আগষ্ট ১৯৯৬

শেষ যুগের আগমনকারী মাহ্‌দী অবশ্যই নবী উল্লাহ্ হবেন

মোজাফফর আহমদ রাজু

আল্লাহ্ তাআলা সূরা ইউনুসের ১৭ আয়াতে অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে ব্যক্ত করেন যে, একজন নবী দাবীকারক ব্যক্তি তাঁর দাবির পূর্বের জীবন তাঁর জাতির কাছে সত্যবাদীতায় ও ন্যায় পরায়নতায় এক অসাধারণ উচ্চ পর্যায়ের মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে থাকে।

যেমন বলা হয়েছে "তুমি বল, আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে আমি এ (ঐশী বাণী তোমাদের পাঠ করে) শুনাতাম না এবং তিনিও এ (শিক্ষা) সম্বন্ধে আমাদের জানাতেন না। নিশ্চয় এ (নবুওয়াতের দাবীর) পূর্বেও আমি তোমাদের মাঝে এক দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছি। তবুও কি তোমরা বিবেক বুদ্ধি খাটাবে না?' এই মহান বাণী যদি পৃথিবীতে নাযিল না হত তাহলে জগতের মানুষ বুঝতেই পারত না যে, নবুওয়াতের সকল ব্যাপার এই মর্তের নয় বরং স্বর্গের বা ঐশ্বরিক। মোট কথা চিন্তা করলেই সহজে অনুমান করা সম্ভব যে, যাকে সৃষ্টি না করলে আসমান ও জমিন বা সৃষ্টি জগত কোনটাই সৃষ্টি করা হত না, তিনি হলেন নবীকুল সরদার মানব শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)। আরব জাতিতে সকল ধরনের অন্ধকার বিরাজমান থাকা সত্বেও তাঁর (সা.) চরিত্র সেই জাতির কাছে কত প্রশংসনীয়, মর্যাদাপূর্ণ, পবিত্র, সত্য, সত্যবাদী, ভদ্রমানুষ, দানশীল, অন্যের প্রতি দয়াবান, অন্যায়ের বাধাদানকারী, নিজে ইয়াতিম হওয়া সত্বেও ইয়াতিমদের ভালবাসা ইত্যাদি গুণে পরিপূর্ণ এক অস্তিত্ব, যাকে দেখে আরবের মানুষ পরিপূর্ণ রূপে বুঝলেন যে, এ যে এক সৃষ্টিকর্তার পূর্ণ রূপ। আরব জাতি তাঁর (সা.) নবুওয়াতের দাবীর পূর্বে শত শত গুণাবলীতে ভূষিত করলেন তাঁকে, হেরা গুহায় আল্লাহ্ তাআলার বাণী লাভ করে প্রথম কুরায়েশদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবী হওয়ার দাবী পেশ করলেন, হে কুরায়েশরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমি নবী, আমার উপর ঈমান আন। নবুওয়াতের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যে জাতি এত উপাধিতে ভূষিত করলো, তারাই তাঁকে (সা.) মিথ্যাবাদী বলতে এক মিনিট বিলম্ব করেনি।

মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক পুত্র আখেরী যুগের নির্ধারিত ইমাম প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) তাঁর কাজ ছিল কুরআন পাঠ করা ও চিন্তা করা, নফল নামাযে শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করে ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য দোয়া করা, যেখানেই ইসলাম ও ইসলামের নবী (সা.)-এর ও পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে কথা বা লিখা হত এখানেই তিনি তাঁর (আ.) সর্ব শক্তি দিয়ে তাঁর সবচেয়ে বড় প্রেমিক মহানবী (সা.)-এর আদর্শের সপক্ষে মোকাবেলা করতেন। হযরত মির্যা গোলাম (আ.) তাঁর মাহ্‌দী ও মসীহ্ দাবীর পূর্বে উম্মতে মুসলেমার বড় বড় আলেম ও লেখকরা তাঁর (আ.) ইসলাম দরদী ও কুরআনী জ্ঞানে ভরপুর এবং মহানবী (সা.)-এর একমাত্র প্রেমিক হিসাবে তাদের নিজেদের লিখনিতে ভূয়সী প্রশংসা করে, শুধু প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তারা তাঁকে এ যুগের মুজাদ্দেদ দাবী করার জন্যও আহ্বান করে। একই ভাবে যখন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) আল্লাহ্‌র আদেশে আখেরী যুগের মহাপুরুষ হওয়ার দাবী করলেন তখন পাঞ্জাবসহ সারা ভারতে হৈ চৈ পরে গেল। যেভাবে কোরায়েশরা মহানবী (সা.)-কে মিথ্যাবাদী বলেছিল সে রূপেই মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কেও তাঁর জাতি মিথ্যাবাদী বললো।

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২৪ ও ২৫ আয়াতে বলেন, 'আর আমরা আমাদের বান্দাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তোমরা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকলে এর মত (অর্থাৎ দাবী কারকের প্রতি অবতীর্ণ সূরার ন্যায়) একটি সূরা (নিদর্শন বা আল্লাহ্‌র নামে দাবী করে বানিয়ে) আন এবং তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে (এ কাজের জন্য) আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমাদের (অন্য সব বানানো) সাহায্যকারীদেরকে ডাক (যেহেতু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দাবী করেও তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করছ না)।" আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীকে দিয়ে ঘোষণা দেওয়ালেন যে, যেহেতু নিদর্শন দেখানো ও পুত-পবিত্র জীবন পেশ করে আল্লাহ্‌র বাণীকে বুঝা তোমাদের কাজ নয় তাই অপর আয়াতে নবীকে মিথ্যা বলার পরিণাম জানালেন। "কিন্তু তোমরা যদি (তা) করতে না পার এবং তোমরা কখনই (তা) করতে পারবে না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার জ্বালানী হলো মানুষ ও পাথর। (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত দাবীকারককে) অস্বীকারকারীদের জন্য এ (আগুন) প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন, আগুনের অনেক অর্থের মধ্যে এটাও যে আখেরী যুগে মাহদী ও মসীহ্ (আ.)-কে না মেনে ফেতনার আগুনে সকলেই জ্বলতে থাকবে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর দাবীর মুকাবেলায় কোন বিরোধী আলেম দাঁড়াতে পারেন নি, বরং তাঁর সত্যতা উপলব্ধি করে বড় বড় আলেম, পীরসহ লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর (আ.) হাতে বয়আত করে মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত দাসত্বে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রমাণ করেছে যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-ই এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী যার পক্ষে কুরআন ও হাদীসে হাজার হাজার দলিল বিদ্যমান।

আল্লাহ্ তাআলার নীতিতে হযরত আদম (আ.) হতে শুরু করে হযরত মহানবী (সা.) পর্যন্ত যত আল্লাহ্ মনোনীত নবী বা রাসূল আগমন করেছেন তাঁদের সকলের সাথে বিরোধীতা করা হয়েছে। সূরা বনী ইসরাইলের ৭৮ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,–তোমার পূর্বে আমরা যেসব রাসূলকে পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও আমাদের এ রীতি প্রযোজ্য ছিল। আর তুমি আমাদের রীতিনীতিতে কোন পরিবর্তন দেখতে পারবে না। এ যুগে আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত মহানবী (সা.)-এর এই গোলাম ইসলামকে পুন:জীবন দানকারী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বেলাতেও তাঁর সম যুগের আলেমগণ বিরোধীতার ঝড় উঠিয়েছে। আল্লাহ্ তাঁকে ওয়াদা দিয়েছেন, তোমার বিরোধিতা সত্বেও তোমার জামা'তের উন্নতি অব্যাহত ধারায় জারি থাকবে। আল্লাহ্ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জন্য পবিত্র কুরআনের সেই চিরন্তন নীতির কথা বলেন,

"আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন, আমি ও আমার রাসূলরা অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিধর (ও) মহাপরাক্রমশালী। "সূরা মুজাদেলায়-ঐশী বাণীতে পরিস্কার বলে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ্ যাকে তাঁর পক্ষ থেকে দাঁড় করান তাঁকে বিজয়ী করেন।

পবিত্র কুরআনের বাণীতে বলা আছে আগামী দিনে সেই ঘটনাই ঘটতে যাচ্ছে বা ঘটবেই বলে দ্বিধাহীন সংবাদ আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীতরা ছাড়া কেহ ব্যক্ত করতে পারে না। হযরত 'মসীহ্ মাওউদ'-এর দাবীদার কাদিয়ান নিবাসী মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, নিজ জীবনে সে সবের কয়েক হাজার ভবিতব্য পূর্ণ হল আর আজও পূর্ণ হচ্ছে আগামীতেও পূর্ণ হতে থাকবে বলেও উল্লেখ করলেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি বললেন, প্লেগ আসবে, ভূমিকম্প হবে, অনেক বিরুদ্ধবাদী মারা যাবে, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হবে, আমার জামাতের উন্নতি হবে, সমস্ত দুনিয়ায় আমার জামাত প্রসার লাভ করবে, আমার এক বিশেষ পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, আমার বস্ত্র হতে বাদশাহ্গণ কল্যাণ অন্বেষণ করবে ইত্যাদি হাজার হাজার ভবিতব্য পূর্ণ হল আর তাঁকে সত্যবাদীরূপে আকাশের সূর্যের ন্যায় প্রকাশ করে দিলেন। যাদের হৃদয়ে পবিত্রতা আছে তারা অবশ্যই এই যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে মেনে আঁ-হযরত (সা.)-এর সবচেয়ে বড় আদেশকে পূর্ণ করবে।

পবিত্র কালাম পাকে সূরা আল্ হাককার ৪৫-৪৮ আয়াতের মধ্যে পরিস্কার বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে দাবী করবে যে, আল্লাহ্ আমাকে নবী বা রাসূল দাবী করতে বলেছেন অথচ সেই দাবীদার ব্যক্তিকে আল্লাহ্ দাবী করতে বলেন নি, তাঁকে আল্লাহ্ তাঁর শক্তিশালী আক্রমণ দ্বারা ধৃত করেন, আল্লাহ্ বলেন, "আর সে যদি কোন মামুলী কথাকে (ও) মিথ্যা বানিয়ে আমাদের প্রতি আরোপ করতো, তাহলে নিশ্চয় আমরা তাকে (দাবীদার ব্যক্তিকে) ডান হাতে ধরতাম এবং আমরা অবশ্যই তাঁর জীবনশিরা কেটে দিতাম। তখন তোমাদের কেউই (আমাদের শাস্তি থেকে) তাকে রক্ষা করতে পারতে না।

উক্ত আয়াতে করিমায় যদিও মহানবী (সা.)-কে বলা হয়েছে, আর তিনি (সা.) যদি নাউযুবিল্লাহ্ মিথ্যা দাবীদার হতেন তা হলে তাঁকে (সা.)-ও আল্লাহ্ ছেড়ে দিতেন না। উম্মতে মুহাম্মদীয়া আগত মসীহ্ নবীউল্লাহ্ ও মাহ্দীয়ে মাওউদ (আ.)-এর জন্যও একই মাপ কাঠি, তার কারণ আগমনকারী মসীহ্ নবীউল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর শরীয়তের পুন:র্জীবন দান করতে আখেরী যুগে আগমন করবেন। তাঁর সত্যতার দলিলতো 'ওয়া আখারীনা মিনহুম, আয়াত দ্বারা ১৫শ বছর পূর্বে সাব্যস্ত হয়েছে বা উল্লেখ করা আছে। দাস তো নিজের মালিকের অবস্থানেই দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে যে, আমি তিনি ভিন্ন কোন সত্তা নই। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) মসীহ্ মাওউদ দাবীদার আজ প্রায় সোয়াশো বছর যাবত নিজেকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সত্য মসীহ্ ও মাহদী দাবী করে আসছেন, তাঁর নিজ জীবদ্দশাতেই মুরিদানদের কয়েক লক্ষ তাঁর সত্যতা সকল দিক থেকে যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করেন, আল্লাহ্র ওয়াদা মাফিক প্রায় ২শত দেশে তাঁর জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁরই সত্যতার উজ্জল ও শক্তিশালী সাক্ষ্য প্রদান করে চলছে। উক্ত আয়াত মাফিক তিনি যদি মিথ্যাবাদী হতেন তাহলে কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর জামা'ত ধরা পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কট্টর বিরোধীতা সত্বেও তাঁর জামা'তের উন্নতি ও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা তাঁকে প্রমাণ করেছে যে, তিনি আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগত প্রতিশ্রুত ব্যক্তি যাঁর আগমন ইসলামকে সমগ্র বিশ্বের সকল ধর্মের উপরে জয়যুক্ত করতে। তাঁর মুকাবেলায় আমেরিকাতে মি: আলেজান্ডার ডুই মসীহ্ হওয়ার দাবী করে বসে। কিন্তু সে মিথ্যাবাদী হওয়াতে আল্লাহ্ তাকে সূরা আল্ হাক্কার ওয়াদানুযায়ী শক্তিশালী হস্তে ধৃত করেন এবং তাকে ধ্বংস করে দেন এবং মির্যা সাহেব (আ.)-এর দাবী সত্য প্রমাণিত হয়।

পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৪৫ আয়াত ও সূরা আল্ মায়েদার ১১৮ আয়াতসহ প্রায় ৩০টি আয়াতে বনী ইসরাইলের জন্য আগত মসীহ্ ঈসা মৃত্যুবরণ করেছেন প্রমাণ করা হয়েছে। সূরা আত্ তাহ্রীম আয়াত ১৩-তে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–আর (আল্লাহ্) ইমরানের কন্যা মরিয়মের (দৃষ্টান্তও বর্ণনা করেছেন)। সে উত্তমরূপে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। ফলে আমরা এর (শিশুপুত্রের) মাঝে আমাদের রূহ্ ফুঁকে দিলাম। আর এর (মা) তার প্রভূ-প্রতিপালকের বাণীর এবং তাঁর কিতাবসমূহেরও সত্যায়ন করলো। আর সে ছিল আনুগত্যকারীদের একজন। উক্ত আয়াতের মধ্যে এই উম্মতে ভবিষ্যতে আগমনকারী মহাপুরুষের আবির্ভাবের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা সূরা আম্বিয়ার মধ্যে উল্লেখ করেছেন হযরত ইব্রাহীমকে নেয়ামত দান করেছিলাম তার মধ্য থেকে ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুবসহ অনেককেই ইমাম বানিয়েছিলাম। আল্লাহ্ তাআলা বলেন–আর আমরা তাদেরকে ইমাম বানিয়েছিলাম। তারা আমাদের আদেশে হেদায়াত দিত এবং আমরা তাদের প্রতি সৎকাজ করতে , নামায কায়েম করতে ও যাকাত দিতে ওহী করতাম। আর তারা সবাই আমাদের ইবাদত করতো। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তাদের সকলকে ইমাম বানিয়েছিলাম এবং তারা হেদায়াতের কাজ করতো, আখেরী যামানায় আগমনকারী ইমাম মাহদী (ইমাম মানে নেতা) (মাহদী মানে হেদায়াতের কাজ করা) (আ.) যে কাজ করতে আসবেন তাহল ইসলামকে জিন্দা করা, কুরআনকে আদর্শিক ভাবে মানুষের মধ্যে কায়েম করা, মহানবীর (সা.) প্রকৃত নমুনাকে পৃথিবীর বুকে তুলে ধরা, আর সূরা আম্বিয়ায় (৭৮ আয়াতের মধ্যে) নবীদের যে গুণাগুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা আভিধানিকভাবে "আইম্মাতান" ও "ইয়াহ্দুনা"র মানে সম্পূর্ণটাই রয়েছে। হযরত মসীহ্ ও মাহদী (আ.)-এর সত্যতার অকাট্য দলিল হল উক্ত কুরআনী আয়াত।

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা আস্ সাজদাতে পরিস্কার বলেছেন, 'হে মুসলমানগণ তোমাদের মধ্যে কুরআনের শিক্ষা থাকবে না কুরআনের শুধু অক্ষর অবশিষ্ট থাকবে, তোমরা মুসলমান দাবীতে থাকবে কিন্তু কুরআনের শিক্ষা না থাকায় প্রকৃত মুসলমান থাকবে না, দাবীতে তোমরা পাকা থাকবে কি ন্তু প্রকৃত অর্থে তোমরা মৃত হবে। আল্লাহ্ বলেন–তিনি পরিকল্পিতভাবে (নিজ) সিদ্ধান্ত আকাশ থেকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করাবেন। এরপর তা এরূপ একদিনে তাঁর দিকে উঠে যাবে যা তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান। উক্ত আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা আমার জন্য তিন শতাব্দী পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ সময় বলেছেন আর কুরআনী সেই এক দিন যা এক হাজার বছর সেই তিনশত বছর পর হতে গণনা করা হবে (তিরমিযী, বুখারী, কিতাবুশ্ শাহাদাত)। আল্লাহ্ ও তাঁর মহানবী (সা.)-এর বাণীই সত্য ও পরিপূর্ণ। কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী (সা.)-এর আদর্শ হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের মধ্য দিয়ে পুনরায় জীবন্ত হবে।

এই উম্মতের শেষ যুগে আগমনকারী ব্যক্তি যে

নবী উল্লাহ্ হবে তা মুসলিম শরীফের হাদীসে মহানবী (সা.) একাধিক বার উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা তা পরিস্কারভাবে সত্যায়ন করা হয়েছে। সূরা আন্ নিসাতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–'আর যে (সব ব্যক্তি) আল্লাহ্ ও এ রাসূলের আনুগত্য করবে এরাই তাদের অন্তর্ভূক্ত হবে, যাদের আল্লাহ্ পুরস্কার দান করেছেন (অর্থাৎ এরা) নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহদের (অন্তর্ভুক্ত হবে)। সূরা আ'রাফে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "হে আদম সন্তান! তোমাদের কাছে যখনই তোমাদের মাঝ থেকে এমন সব রাসূল আসবে যারা আমার আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বর্ণনা করবে তখন যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করবে এবং (নিজেদেরকে) শুধরে নিবে তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না। সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–আর (স্মরণ কর) আল্লাহ্ যখন (আহলে কিতাবের কাছ থেকে) সব নবীর (মাধ্যমে এই বলে) অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, 'আমি কিতাব ও প্রজ্ঞার যা-ই তোমাদের দেই এরপর তোমাদের কাছে যা রয়েছে এর সত্যায়নকারী কোন রাসূল তোমাদের কাছে এলে তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে।'

উক্ত আয়াতে মহানবী (সা.)-কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা সূরা আহযাবের ৮নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা এভাবে বলেন– 'আর (স্মরণ কর) আমরা যখন নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তোমার কাছ থেকেও এবং নূহ্, ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ম-পুত্র ঈসার কাছ থেকেও (অঙ্গীকার নিয়েছিলাম)।' যখন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ও চিন্তাবিদরা বলছে মক্কায় আগত মুহাম্মদ (সা.)-এর মত একজন মহামানবের খুবই প্রয়োজন, অপরদিকে তিনি (সা.) এসে মানুষের জন্য নবীর মাধ্যমে আল্লাহকে পাবার সকল পথ বন্ধ করে দিলেন? এটা হতে পারে না, এই কথা তো দুনিয়াবী মোল্লাদের কিন্তু আল্লাহ্র বাণীতে তাঁর মনোনীত বান্দার আগমনের পথ উন্মুক্ত কিন্তু তা মহানবী (সা.)-এর গোলামীর মাধ্যমে সম্ভব।

মা যেমন বলতে পারে পিতার পরিচয়, জগতের সকলে একত্রিত হয়েও যদি বলে যে, ইনি তোমার পিতা নন কিন্তু মা একা বললেই সন্তান বিশ্বাস করে যে তার পিতা কোনটি, পৃথিবীতে নবীরা আগমন করে আল্লাহ্র পরিচয় মানুষের নিকট তুলে ধরে আল্লাহকে গ্রহণ করে তাঁর ইবাদত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নবীর বিরোধীতা করা হয় বটে কিন্তু নবীর সত্যতা যখন কোন মানবজাতির কাছে প্রমাণিত হয় তখন সেই সত্য নবীকে গ্রহণ করে তাঁর সত্যতার প্রমাণ দিতে গিয়ে বা ভালবাসায় জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিতে নবীর প্রিয় বান্দারা কুণ্ঠিত হয়নি। সেই নবী যখন তাদের মধ্য থেকে বিদায় নেয় তখন তাঁর উম্মত বা জাতির উপর মহা বিপর্যয় নেমে আসে। আর সেই জাতি পাগল প্রায় হয়ে নানান কথা বলতে থাকে। পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত এখানে ব্যক্ত করলেই পাঠকগণ অনুমান করতে পারবেন যে, স্বনবীর বিচ্ছেদের দরুন জাতি এক ধরনের উন্মাদনার কারণে বলে যে আর কোন নবী আসবে না। সূরা আল্ মু'মেনের ৩৫ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–"আর নিশ্চয় তোমাদের কাছে ইতোপূর্বে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে ইউসুফও এসেছিল সে সম্পর্কে তোমরা সব সময় সন্দেহে পড়ে রইলে। অবশেষে সে যখন মারা গেল তোমরা বলতে আরম্ভ করলে, 'এখন তার পরে আল্লাহ্ কখনো কোন রাসূল পাঠাবেন না। এভাবেই আল্লাহ্ প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী (এবং) সন্দেহ পোষণকারীকে বিপথগামী সাব্যস্ত করেন।

উক্ত আয়াতের উক্তিতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জাতির অভিব্যক্তিতে কোন নবী-রাসূল না আসার কথা বলা হয়েছে, এর মানে জাতি তাঁর প্রতি ভালবাসায় একথা বলেছে। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্র নির্দেশে ৪০ দিনের জন্য তুর পর্বতে গিয়েছিল, যা রূহানী রশদ মূসার কাছ থেকে সত্য জাতি পাচ্ছিল। তা ৪০ দিন না পাওয়ায় গোবৎসকে মাবুদরূপে গ্রহণ করলো। হযরত ঈসা (আ.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর ভালবাসা এত দূর পর্যন্ত পৌঁছলো যে, তাঁকে খোদার আসনে বসালো তাঁর জাতি। কিন্তু না আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের এ দাবীগুলো মৌখিক মাত্র, মানুষ কখনও খোদা হতে পারে না, তিনি মারা গেছেন। সর্ব শ্রেষ্ঠ রাসূল মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পরে হযরত ওমর (রা.) এর মতো এত বড় সাহাবী পাগল প্রায় হয়ে নাংগা তরবারী হাতে নিলেন, কিন্তু তাঁর (সা.) এরপরে যাকে আল্লাহ্ খলীফারূপে গ্রহণ করতে যাচ্ছেন তাঁকে দিয়ে কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৪৫ আয়াত পাঠ করিয়ে ওমর (রা.) সহ মুসলমানদেরকে জানালেন যে নবী মুহাম্মদ (সা.) মারা গেছেন, তার পূর্বেকার নবী-রাসূলদের মতই। পৃথিবীতে কুরআনী শরীয়ত থাকবে, ইসলাম থাকবে, নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আনিত ধর্ম থাকবে, মানুষ জন্ম হতে থাকবে, মানুষে মানুষে হানাহানি হতে থাকবে, খারাবী বিস্তার লাভ করতে থাকবে, কিন্তু এগুলোর জন্য কোন ঐশী মনোনীত আল্লাহ্র নবী রাসূল থাকবে না এ কেমন বিচার। না মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক এ যুগের মসীহ্ ও মাহ্দী কুরআনের অসংখ্য আয়াত অনুযায়ী তিনি উম্মতী নবী হবেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ মাহ্দী ও মসীহ্ (আ.) হযরত মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য চরম পর্যায়ে করতে করতে, গোলামী দাসত্ব ও চাকর নবীর দায়িত্ব লাভ করেছেন। এ যুগের দাবীদার হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেন, আমি যা কিছু লাভ করেছি, তা আমার প্রিয় আমার অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়, প্রভু হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর রূহানী ফয়েজের কারণে।

স্মরণ রাখুন, আদম থেকে শুরু করে হযরত মহানবী (সা.) পর্যন্ত যত নবী রাসূল আগমন করেছেন সকলের বিরোধীতা একই রূপে করা হয়েছে কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর মহাপুরুষকে সাহায্য করেছেন। আজও তাই মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে আল্লাহ্ সাহায্য করেছেন তাঁর জামা'ত আজ বিজয়ের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আমরা আল্লাহ্ তাআলার দরবারে এ দোয়াই করবো 'হে খোদা তুমি মানবজাতিকে ঐশী জ্ঞান থেকে লাভবান হতে সাহায্য কর, আমীন'।

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ময়মনসিংহের সেক্রেটারী মাল জনাব আতিক উজ-জামানের স্ত্রী জনাবা ইয়াসমিন সুলতানা গত ১৮ এপ্রিল রোজ সোমবার রাত ৮-৪০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৩৮ বছর। তিনি লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। মরহুমা একজন নেক, ধৈর্যশীল ও পরহেজগার আহমদী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ১ পুত্র সন্তান রেখে যান। তার রূহের মাগফিরাতের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট বিনীতভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়া কামনায় মরহুমার পুত্র

আকিব উজ-জামান (অনিক)

ইসলামে সামাজিক জীবন

সরফরাজ এম. এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

তাই আমরা দেখতে পাই, হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর পুত-পবিত্র দেহ সমাধিস্থ হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত মু'মিনগণের নির্বাচনের মাধ্যমে হযরত আবু বকর (রা.) খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। খিলাফত আল্লাহ্ ও মানুষের সংযোগস্থল, মুসলমান জাতির প্রাণ শিরা। হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, কেমন করে আমার উম্মত ধ্বংস হতে পারে, যার প্রথম ভাগে আমি, মধ্য ভাগে মাহ্দী এবং শেষ ভাগে মসীহ্। কিন্তু মধ্যবর্তী সময়ে পথভ্রান্তের দল হবে যারা আমার নয় এবং আমিও তাদের নই (মিশকাত)।

উপরোক্ত হাদীসের মর্মার্থ এই যে, উম্মতের প্রথম ভাগে স্বয়ং হযরত নবী করীম (সা.) এবং শেষ ভাগে ঈসা নবী উল্লাহ্ এবং মধ্য ভাগে ক্ষণস্থায়ী খিলাফতে রাশেদার পর ভ্রান্তের দল এবং তাদেরকে সৎ পথে চালিত করার জন্য মাহ্দীগণ। এই মাহ্দীগণই মুজাদ্দেদ, যাদের সম্বন্ধে হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দেদ আবির্ভূত করবেন, যিনি এসে তাদের জন্য ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন (আবুদাউদ)।

মুসলমান জাতির প্রথমবারের মতো ইসলাম থেকে বড় রকমের পদচ্যুতি ঘটে খিলাফত হারানোতে। অত:পর আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.), হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.), হযরত আহম্মদ বিন হাম্বল (রহ.), হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.), হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহ.), হযরত খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি (রহ.), হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রহ.)-এর মত মহাপুরুষগণকে কুরআনী জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে প্রতি যুগে যুগে এ ধরাধামে আবির্ভূত করে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে রক্ষা করে আসছেন। কোন রাজা-বাদশাহ্ অথবা খতীব বা মুফতি দ্বারা নয়। ইসলামের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, উপরোক্ত মহামানবগণের সূক্ষ্ম কথা বুঝতে না পেরে সমসাময়িক বাহ্যদর্শী ধর্মযাজকগণ ধর্ম সংস্কারকদের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। কাফির নাস্তিক ইত্যাদি ফতোয়া দিয়ে অশ্লীল এবং অকথ্য ভাষায় তাদেরকে গালি-গালাজ করেছে। রাজা বাশাহ্রা ক্ষমতার বলে সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা করে তাদেরকে নানাভাবে অত্যাচার উৎপীড়ন করেছে।

ইসলাম বিশ্বজনীন শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। এর প্রকৃত অর্থ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আত্মসমর্পণ। একমাত্র আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভরতা, তাঁতেই আসক্তি, তাঁর জন্যই ব্যাকুলতা, তাঁতেই প্রেম, তাঁতেই অনুরাগ, তাঁকেই ভালবাসা, তাঁকেই ভক্তি, তাঁকেই ভয়, তাঁরি জন্য কর্ম, তাঁরই জন্য জীবন, তাঁরই জন্য মরণ, তাঁরই সর্বস্ব। স্বীয় ধ্যান-ধারণা, বাসনা-কামনা, আশা আকাঙ্খা, দৈনন্দিন জীবনের যত কিছু করণীয় কর্তব্য সমূহ ইত্যাদি সকলই একমাত্র মহান আল্লাহ্ তাআলার প্রতি সমর্পণ করা।

"তারা কি আল্লাহ্র ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম চায়? অথচ আসমান জমিনে সব কিছু ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, তারা ইসলাম (আত্মসমর্পনের ধর্ম) গ্রহণ করেছে" (সূরা আলে ইমরান)। সৃষ্টির দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, সৃষ্টির প্রত্যেকটি বস্তুই আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছার উপর আত্মসমর্পণ করে একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে। ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, তারা প্রকৃতির সেই নিয়ম শৃঙ্খলার গন্ডী অতিক্রম করতে পারে না। রবি-শশী, গ্রহ-নক্ষত্র, বিশাল ধরিত্রী, বায়ু মন্ডল, আলোক আঁধার, অগ্নি, জল, সাগর, মহাসাগর বেগবতী তটিনী জীবদেহের ক্রমবর্দ্ধন, বৃক্ষদেহের রস প্রবাহ জীবন মরণ ইত্যাদি আল্লাহ্ তাআলার সেই বিধানকে মেনে চলছে। প্রকৃতির প্রত্যেকটি অংশই আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছার উপর আত্মসমর্পণ করে একই নিয়মানুসারে সমগ্র সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই নিয়মকে লংঘন অথবা সংশোধন করার ক্ষমতা কারো নেই। মানুষ আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টি-শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষকে কেন্দ্র করেই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি। সুতরাং মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর তুলনায় অধিক। পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ্ তাআলার প্রতিনিধি। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সকল সৃষ্ট বস্তুকেই মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। অতএব মানুষ যদি আল্লাহ্ তাআলার নিয়ম শৃংখলাকে লংঘন করত: তার দায়িত্ব ও কর্তব্যকে ভুলে যায়, এ ক্ষেত্রে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়ে পারে না। পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা সেই নিয়ম শৃঙ্খলা এবং দায়িত্ব কর্তব্য সম্বন্ধে কঠোর তাগিদ দিয়ে বলেছেন, "তোমরা আল্লাহ্র 'রজ্জুকে' অর্থাৎ আল্লাহ্র খিলাফতকে সকলে মিলে একত্রে শক্তভাবে ধারণ কর, সাবধান দল ও উপদলে বিভিক্ত হয়ে পরস্পর বিরোধ করো না।

" সৃষ্টির পালে নযর দিলে দেখা যায় যে, সূর্যকে নিজ নিজ গতিপথে একই নিয়মে পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি পরিভ্রমণ করত: আপন আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে। এদের মধ্যে কারো সাথে কারো বিরোধ নেই। এরূপ না হলে সৃষ্টির রাজত্বে বিপর্যয় দেখা দিত। অবিকল এমনিভাবে আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম ইসলামকে একটি সুশৃংখল নিয়মে সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে পরিচালনা করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। খিলাফত আল্লাহ্ ও মানুষের সংযোগ স্থল, ঈমানদার মু'মিন মুসলমানের প্রাণ শিরা।

খিলাফত বিহীন জাতি প্রাণহীন দেহের তুল্য। সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বকেই ইসলামে গণতন্ত্র বুঝায়। ইসলাম মানুষকে যে পূর্ণ গণতন্ত্র দিয়েছে জগতের ইতিহাসে এর কোন নজির মিলে না। মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং ভাইয়ে ভাইয়ে কারো সাথে কারো বিরোধ নেই, এক ভাই অপর ভাইয়ের সুখে দুঃখের সমান অংশীদার। তাই বিশ্ব নবী হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "মুসলমানগণ পরস্পর পরস্পরের জন্য, পরস্পর বন্ধুত্বের জন্য, পরস্পর স্নেহশীলতার জন্য, এরূপ সম্বন্ধবদ্ধ যে, যেমন মানুষের একটি শরীর। শরীরের কোন নির্দিষ্ট অঙ্গ বেদনাক্লিষ্ট হলে তা সমস্ত শরীরকে সেরূপ যন্ত্রণা ও কষ্টের অনুভূতি দ্বারা জাগ্রত করে তুলে।" "মুসলিম সমাজের দৃষ্টান্ত একটি প্রাচীরের ন্যায়, যার ইটগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত।" "কোন মুসলমানের পক্ষে হালাল

নয়, যে বিদ্বেষ বশত: অপর কোন মুসলমানের সঙ্গে তিন দিবসের অতিরিক্ত কাল কথাবার্তা না বলে মারা যায়, এই ব্যক্তির স্থান জাহান্নামে।”

“এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, সে অপরকে জুলুম করবে না। হযরত রাসূল করীম (সা.) তিনবার বক্ষের দিকে ইশারা করে বললেন, পরহেজগারী এই স্থানে, কোন ব্যক্তির মন্দ কাজের জন্য ইহাই যথেষ্ঠ যে সে ব্যক্তি তার ভাই মুসলমানকে হেয় মনে করে। এক মুসলমানের পক্ষে হারাম তার জান মাল এবং ইজ্জত। “আল্লাহ্‌র কসম তার খাঁটি ঈমান নাই (তিনবার বল্লেন) সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কার এবং কোন ব্যক্তির খাঁটি ঈমান নাই? উত্তরে হুযূর (সা.) বললেন, যার হস্ত এবং জবান থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।”

“সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান নয় যে নিজে পেট ভরে খায় এবং প্রতিবেশী উপবাসে রাত কাটায়।” পৃথিবীতে মানুষ একটি পরিবারতুল্য। আল্লাহ্ এই পরিবারের কর্তা। মু'মিন মুসলমান পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি মাত্র। মু'মিনগণের ত্যাগের আদর্শ শিক্ষার ফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণ আল্লাহ্‌র প্রতি সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য একটি সুষ্ঠু নিয়মের মাধ্যমে খলীফার আদেশে আপন ধন, জন, মান সম্মান এমন কি নিজের প্রাণকে পর্যন্ত উৎসর্গ করে তৃপ্তি লাভ করে থাকেন। এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই, সুতরাং প্রতিটি মুসলমানেরই নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। প্রতিবেশীর হক, দরিদ্রের হক, এতিমের হক, পীড়িতের হক ইত্যাদি আপন-আপন দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যে গণ্য।

ইসলামের খলীফাগণ আইনের বলে মানুষের উপর গণতন্ত্র চাপিয়ে দিয়ে নয়, বরং ত্যাগের আদর্শ শিক্ষায় মানুষকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করেন। গণতন্ত্রের জন্য মানুষ নহে, মানুষের জন্য গণতন্ত্র। খলীফাকে কেন্দ্র করে ত্যাগের মাধ্যমে মানুষ নিজেরাই গণতন্ত্র কায়েম রাখবে। অবস্থা ভেদে, স্থান কাল এবং পাত্র ভেদে প্রতিটি মানুষই এর জন্য দায়ী।

পবিত্র কুরআন মজীদ মুসলমান জাতির ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অবিরাম সু-সংবাদ দিয়ে ঘোষণা করেছে, “ওরা চায় যে আল্লাহ্‌র নূরকে তারা নিজেদের ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেবে কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নূরকে পূর্ণতা দান না করে কিছুতেই ছাড়বেন না, কাফেরদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন। তিনিই তো (আল্লাহ্) নিজের রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি (রাসূল) তাঁকে সম্পূর্ণ দ্বীনের উপর পূর্ণরূপে বিকশিত-উদ্ভাসিত বিজয়ী করে দেন, তা সহ্য করা মুশরেকদের যতই অপছন্দ হোক না কেন” (সূরা তাওবা)। “তিনিই তো (আল্লাহ্) নিজের রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি (রাসূল) তাকে সম্পূর্ণ দ্বীনের উপর পূর্ণরূপে বিকশিত উদ্ভাসিত-বিজয়ী করে দেন, আর এই মহাসত্য সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যই যথেষ্ঠ” (সূরা সফ)। “এতো একটি উপদেশ সমগ্র বিশ্বাবাসীর জন্য। আর অতি অল্পকাল পরেই এর সত্য সংবাদে ঘটনা সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে” (সূরা সাদ)। “আর যবুর' কিতাবে নসীহতের পর আমরা লিখে দিয়েছি যে, “আমার নেক বান্দাগণ জমিনের উত্তারাধিকারী হবে” (সূরা আম্বিয়া)।

“আল্লাহ্ লিখে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আমি এবং আমার রাসূলই বিজয়ী হবো। বস্তুত আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী সর্ববিজয়ী”। (সূরা মুযাদালা) “আর ঘোষণা কর, সত্য এসে গেছে, বাতিল নির্মুল হয়ে গেছে। মিথ্যা তথা বাতিলের অবলুপ্তি সুনিশ্চিত।” (সূরা বনী ইসরাঈল) “বরং আমরা তো বাতিলের উপর সত্যের দ্বারা আঘাত হেনে থাকি, যা বাতিলের মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। “বলো, সত্য এসেছে এবং বাতিল আর প্রবর্তিত হবে না এবং বাতিলকে ফেরতও আনা যাবে না।” (সূরা সাবা) “অতএব ধৈর্যধারণ কর, আল্লাহ্‌র ওয়াদা নিশ্চিতভাবেই সত্য।”(সূরা মুমিন) “নিশ্চিতভাবে কেবল আল্লাহ্‌র দলই জয়ী হবে।” (সূরা মায়েদা)

“জেনে রাখ, কেবল আল্লাহ্‌র দলই সফল ও কামিয়াব হবে।” (সূরা মুজাদালা) তোমরা যদি আল্লাহ্‌র সাহায্য কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদক্ষেপে দৃঢ়তা ও স্থিতি দান করবেন।” (সূরা মুহাম্মদ) “আল্লাহ্ অবশ্যই সেই লোকদের সাহায্য করবেন, যারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে।” (সূরা আল হজ্জ) “নিশ্চিত জেনো, আমরা নবী-রাসূলদের ও ঈমানদার মু'মিনদেরকে সাহায্য এই দুনিয়ার জীবনে অবশ্যই করে থাকি আর সেদিনও করবো যেদিন সাক্ষীরা দন্ডায়মান হবে।” (সূরা আল মু'মিন)

এইরূপ সুসংবাদ দানকারী বহু পবিত্র কুরআন করীমের স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে, বাতিলের বিরুদ্ধে হকের এবং অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের নেক বান্দা মু'মিনদের বিজয়ের এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র নেক বান্দা মু'মিনগণের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তার কথা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া কুরআন করীমে মু'মিন মুসলমানদেরকে সংখ্যা স্বল্পতার ভয়ভীতির আশংকা থেকে নিশ্চয়তা দিয়েছে। “কতবারই দেখা গেছে যে, একটি ক্ষুদ্রদল আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে একটি বৃহৎদলের উপর জয়ী হয়েছে।” (সূরা বাকারা) কুরআন করীমে বহুবার মু'মিনদেরকে বিজয়, সাহায্য এবং অসত্যের উপর সত্যের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আর সবকিছুই মু'মিনদেরকে আলোকিত ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্খা প্রত্যাশা এবং সাহস ও শক্তি যোগাবে আর তা কোন স্থান কালের গন্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়।

প্রশ্ন হয় সত্যিকারের মু'মিন মুসলমান কারা? পবিত্র কুরআন করীমে প্রকৃত মু'মিন মুসলমানের শর্তারোপ করে বলেছেন, “যারা তওবা করবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে এবং আল্লাহ্‌র ‘রজ্জুকে’ (খিলাফতকে) শক্তভাবে ধারণ করবে আর শুধু আল্লাহ্‌রই এবাদত করবে তারাই হবে মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ্ শীঘ্রই মু'মিনদেরকে মহাপুরস্কার দিবেন।” (সূরা নিসা) বোঝা গেল যে আল্লাহ্‌র খিলাফতকে যারা শক্তভাবে ধারন করে চলবে, তারাই হবে মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত। যারা আল্লাহ্‌র খিলাফতকে অমান্য ও অবহেলা করে চলবে, তারা আল্লাহ্ তাআলার কঠোর নির্দেশকে অমান্য ও অস্বীকারকারীরূপে পরিগণিত হবে কখনো মু'মিন মুসলমান থাকবে না। তারা যতই নামায রোযা হজ্জব্রত পালন করুন না কেন, আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে মু'মিন থাকবে না।

পবিত্র কালামে আল্লাহ্ তাআলা মু'মিন মুসলমানদেরকে বলেছেন, “ হে মু'মিনগণ! আমি এমন এক বাণিজ্যের সংবাদ দিব যা তোমাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন সম্পদ জীবন পূর্ণ রেখে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বোঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহ। মহান আল্লাহ্ তাআলা মু'মিনগণকে দুনিয়াতে বিজয় এবং আখিরাতে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। মু'মিনদেরকে দয়াময় আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয় দান করুন।

ধর্ম মানুষের জন্য
কোন নির্দিষ্ট গন্ডিতে সীমাবদ্ধ ভূখন্ডের জন্য নয়

মাহমুদ আহমদ সুমন

কয়েক মাস পূর্বে দেশের প্রায় সব ক'টি জাতীয় পত্রিকায় 'বাংলাদেশ এখন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। আর সংবাদগুলোতে উল্লেখ ছিল 'পঞ্চম সংশোধনী বিষয়ে আপিল বিভাগের রায়ে বাহাত্তরের সংবিধান পুনঃস্থাপিত হয়ে গেছে। এই রায়ের পর বাংলাদেশ এখন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

কারণ বাহাত্তরের সংবিধানের চারটি মূল স্তম্ভের একটি হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা।' বাহাত্তরের সংবিধান প্রতিস্থাপিত হচ্ছে সংবাদটি পড়ে সবারই ভাল লেগেছিল যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হচ্ছে বলে। কিন্তু গত কালের (২১/০৬/১১) পত্রিকায় দেখলাম রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও বিসমিল্লাহ্ রেখেই সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছেন।

এটা কিভাবে হতে পারে? একটি রাষ্ট্রে মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধসহ নানান ধর্মের অনুসারী বসবাস করে থাকেন। রাষ্ট্রতো কোন বিশেষ ধর্মের হতে পারে না। ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত বিষয় আর রাষ্ট্র হচ্ছে সবার। কোন দেশের রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে কোন বিশেষ ধর্মকে স্থান দেয়া আমার মনে হয় মোটেও ঠিক নয়। সবাই তার নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে যেন পারে এটাই রাষ্ট্রের দায়ীত্ব।

বর্তমান সরকার বলেছিলেন তারা '৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাবেন। কিন্তু তা আর মনে হয় হচ্ছে না। আমরা জানি, '৭২-এর সংবিধানে উল্লেখ ছিল 'মানুষের ওপর মানুষের শোষণ হতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।' (অনুচ্ছেদ ১০) এখানে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক চিন্তার প্রাধাণ্য পাওয়া যায়। এবং ১২ অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার ১২ (গ)' বন্ধ করার কথা বলা হয়েছিল।

৪১ অনুচ্ছেদে সকল ধর্ম পালন ও প্রচারের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। অনুচ্ছেদ ২৭ এ 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'। এ দু'টি অনুচ্ছেদ অর্থাৎ ২৭ এবং ৪১ মৌলিক অধিকার এখন পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। কিন্তু ১২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার বন্ধ করার কথা বলা হয়েছিল তা এতদিন সংবিধান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। যার ফলে এদেশে শত শত ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের উদ্ভোব হয়েছে। আবারও বাংলাদেশ '৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাচ্ছে এটা দেশবাসীর জন্য অনেক আসার কারণ।

ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব হলো, এটা প্রত্যেক মানুষকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে। এই স্বাধীনতা কেবল ধর্ম-বিশ্বাস লালন-পালন করার স্বাধীনতা নয় বরং ধর্ম না করার বা ধর্ম বর্জন করার স্বাধীনতাও এই ধর্মীয় স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, 'তুমি বল, তোমার প্রতিপালক-প্রভুর পক্ষ থেকে পূর্ন সত্য সমাগত, অতএব যার ইচছা সে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা সে অস্বীকার করুক' (সূরা কাহাফ : ২৯ আয়াত)।

সত্য ও সুন্দর নিজ সত্তায় এত আকর্ষণীয় হয়ে থাকে যার কারণে মানুষ নিজে নিজেই এর দিকে আকৃষ্ট হয়। বলপ্রয়োগ বা রাষ্ট্রশক্তি নিয়োগ করে সত্যকে সত্য আর সুন্দরকে সুন্দর ঘোষণা করানো অজ্ঞতার পরিচায়ক। এই নিয়ে গায়ের জোর খাটানোর বা বিতন্ডার অবকাশ নেই।

সূর্যোদয় সত্বেও কেউ যদি সূর্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তাকে বোকা বলা যেতে পারে কিন্তু তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার কিছুই নেই। ঠিক তেমনি কে আল্লাহকে মানলো বা মানলো না, কে ধর্ম করলো বা করলো না এটা নিয়ে এ জগতে বিচার বসানোর কোন শিক্ষা ইসলাম ধর্মে নেই। বরং এর বিচার পরকালে আল্লাহ্ নিজে করবেন বলে তাঁর শেষ শরীয়ত গ্রন্থ আল কুরআনে বার বার জানিয়েছেন।

এ স্বাধীনতা কাজে লাগিয়ে সমাজে আস্তিকও থাকবে, নাস্তিকও থাকবে। মুসলমানও থাকবে হিন্দুও থাকবে এবং অন্যান্য মতাবলম্বীরাও থাকবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালনা করার ইসলামী শিক্ষা কি আর ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে ইসলাম কি বলে তাও জানা প্রয়োজন।

ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্র পরিচালনার একটি নীতি। এর অর্থ ধর্মহীনতা বা ধর্ম বিমুখতা নয়। এর অর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নায়করা নাগরিকদের ধর্ম বা বিশ্বাসের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবেন। কে কোন্ ধর্মে বিশ্বাসী বা কে অবিশ্বাসী অথবা নাস্তিক এ বিষয়ে রাষ্ট্র-যন্ত্র কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করবে না। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার, সবাই রাষ্টের দৃষ্টিতে সমান-এই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা।

পূর্ণ নিরপেক্ষতা ছাড়া পক্ষপাতহীন ন্যায় বিচার সম্ভব নয়। ইসলাম ধর্মের এই অমোঘ শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনে। মক্কার নির্যাতিত অবস্থা থেকে মুক্তি চেয়ে ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের প্রত্যাশায় তিনি মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় পৌঁছানোর পর মদীনার ইহুদী ও অন্যান্য ধর্ম গোষ্ঠী ও গোত্রের সাথে তিনি একটি 'সন্ধি' করেন। এই সন্ধি 'মদীনা সনদ' নামে বিখ্যাত।

'মদীনা সনদের' প্রতিটি ছত্রে সকল ধর্মের ও বর্ণের মানুষের সমান নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। মদীনা রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে এক জাতিভুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মদীনা সনদের ২৫ নম্বর ধারায় ধর্ম নিরপেক্ষতার একটি বিরল উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এতে বলা হয় : ২৫. বনু আওফ গোত্রের

ইহুদীরা মু'মিনদের সাথে একই উম্মতভুক্ত বলে গণ্য হবে। ইহুদীদের জন্য ইহুদীদের ধর্ম, মুসলমানদের জন্য মুসলমানদের ধর্ম। একই কথা এদের মিত্রদের এবং এদের নিজেদের জন্য প্রযোজ্য। তবে যে অত্যাচার করবে এবং অপরাধ করবে সে কেবল নিজেকে এবং নিজ পরিবারকেই বিপদগস্থ করবে।

একটু ভেবে দেখুন, কি চমৎকার শিক্ষা! বিশ্বনবী, মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিষ্ঠিত নীতি হলো, যে যে ধর্মেরই হোক না কেন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাদের জাগতিক অবস্থান সমান। এটি নিছক একটি ঘোষণাই ছিল না। বরং মহানবী (সা.) মদীনার শাসনকাজ পরিচালনাকালে এর সুষ্ঠ বাস্তবায়নও করেছিলেন। একবার মহানবী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নিয়ে একজন মুসলমান ও একজন ইহুদীর মাঝে বাক-বিতন্ডা হয়।

এক পর্যায়ে বিতন্ডা তিক্ততার স্তরে উপনীত হলে সেই ইহুদী মহানবী (সা.)-এর কাছে বিচারপ্রার্থী হয়। মহানবী (সা.) নিরপেক্ষ শাসক হিসেবে রায় দিয়ে বলেন, তোমরা আমাকে মুসার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া লে ইবনে কাসীর, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৩৭)। এর অর্থ হচ্ছে, আধ্যাত্মিক জগতে কে শ্রেষ্ঠ আর কে শ্রেষ্ঠ না এটা মানুষের সিদ্ধান্তের বিষয় নয়। অতএব এ নিয়ে সামাজিক অশান্তি সৃষ্টি করতে যেও না। ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ইসলামের শিক্ষানুযায়ী দ্ব্যর্থহীনভাবে সাব্যস্ত।

পরিশেষে বলবো, ধর্ম নিরপেক্ষতা এমন একটি চশমা যা পরিধান করলে শাসকদের চোখে ধর্ম-বর্ণ নিংর্বিশেষে প্রতিটি মানুষ কেবল একজন মানুষ হিসেবেই ধরা দেয়। তখন সে খোদার এক সম্মানিত সৃষ্টি হিসেবে মনে হয় যার প্রতি ন্যায় বিচার ও সদাচরণ করা শাসকদের পবিত্র দায়িত্ব। এই শিক্ষা আমরা মহান আল্লাহর ব্যবহার থেকেও গ্রহণ করতে পারি।

তিনি যেমন মুসলমান-অমুসলমান, আস্তিক-নাস্তিক, পূণ্যবান-পাপী নিংর্বিশেষে সবার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাদের সৎকর্মের প্রতিদান দেন, সবাইকে সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত করেন সবাইকে তার করুণার বৃষ্টি বর্ষণ করেন ঠিক তেমনি জাগতিক সরকার বা রাষ্ট্র নায়কদেরও এই গুণটি অবলম্বন করা উচিত। তবেই রাষ্ট্র ও দেশ হবে সুখি, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ।

masumon83@yahoo.com

চলুন আমরা তাক্‌ওয়াশীল মানুষ হই

এনামুল হক রনি

মহান আল্লাহ্‌র এক অপরিবর্তনীয় বিধান হলো যারা বা যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র প্রতি রুজু বা আকৃষ্ট হয় আল্লাহ্‌ তাদেরকেই হেদায়াত দান করেন। আর যারা আল্লাহ্‌ থেকে বিমুখ অর্থাৎ আহ্বানে সাড়া দেয় না বরং হেদায়াত গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে তাদেরকে তিনি তাদেরই মর্জির উপরে ছেড়ে দেন। ফলে তারা নিজেরাই বিপদগামী হয়ে যায়।

মহান স্রষ্টার সন্ধান করা মানবাত্মার এক চিরন্তন প্রবল ইচ্ছা আর এটাই মানবজীবনের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্য যখন অর্জিত হয় তখনই মানুষের মনে চরম শান্তি বিরাজ করে। কারণ সে তখন নিজে আল্লাহ্‌ তাআলার ক্রোড়ে বা তাঁর আশ্রয়ে আছে এই প্রত্যয়ের সাথে জীবন যাপন করতে থাকে। আর এই অবস্থায় আসার জন্য মানুষের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় তাক্‌ওয়া নিয়ে চলতে হয়। আর এভাবে চলতে চলতে একদিন সে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। তাই এ পথ বন্ধুর, এ পথ সহজসাধ্য নয়, এ পথ তাক্‌ওয়ার আর এ পথ সিরাতাল মুসতাকীম। আর এ পথের দিশা দিবে মূলত: তাক্‌ওয়া অর্থাৎ খোদাভীতি।

তাক্‌ওয়া কি?

তাক্‌ওয়া কি? এ বিষয়ে আমাদের জানা দরকার। আল্লাহ্‌ পাক পরওয়ারদিগার তাঁর পাক কালামে বিভিন্ন স্থানে তাক্‌ওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। নিচে একটি আয়াত পেশ করছি, **"ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানুত্তাকুল্লাহা হাক্কাতুকাতিহি ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন।"** অর্থ: হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর সত্যিকার যেভাবে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করা উচিত। আর তোমরা কখনও আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মরো না। (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

এখানে সত্যিকার তাক্‌ওয়া অবলম্বন করতে বলা হয়েছে তাই আমাদেরকে তাক্‌ওয়া সম্বন্ধে জানতে হবে বা বুঝতে হবে। 'তাক্‌ওয়া' হলো আরবী শব্দ যার অর্থ হচ্ছে ভয় করা, রক্ষা করা, বেঁচে চলা, অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা, বিরত থাকা ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন সতর্কতার সাথে চলা বা ভয় করে চলা যেন কোন ভাল কাজ হাত ছাড়া না হয়ে যায়। আর কোন মন্দ কাজ কখনও যেন না করা হয়। এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হওয়াকে তাক্‌ওয়া বা খোদাভীতি বলে।

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) বলেন, তাক্‌ওয়া কী? ইহা হইল সবধরণের পাপ হতে নিজেকে রক্ষা করা। অতএব, খোদা তাআলা বলেন, পুণ্যবানদের জন্য প্রথম পুরস্কার কর্পূরের শরবত। এ শরবত পান করলে মন্দ করার ক্ষেত্রে হৃদয় ঠান্ডা হয়ে যায়। এরপর তাদের হৃদয়ে মন্দ ও পাপ কাজের জন্য ইচ্ছার উদ্রেক হয় না। (মলফুযাত, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৭৫)

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন, তাকওয়াশীল ব্যক্তির দ্বারা কোন মন্দকাজ হতে পারে না। তিনি (আ.) বলেছেন, 'তাক্‌ওয়া এই কথার নাম, সে যখন দেখে যে পাপে পড়িয়া যায় তখন সে দোয়া ও তদবীরের সাথে কাজ করে নতুবা সে নির্বোধ হবে। (মলফুযাত, ৬ষ্ঠ খন্ড)

এখন জানা দরকার যে তাক্‌ওয়া অর্জন করে অর্থাৎ সেই মুত্তাকী কে?

একজন মুত্তাকী সে, যে খোদার তাক্‌ওয়া অর্জন করে। মহান আল্লাহ্‌ মুত্তাকীর পরিচয় তুলে ধরে উল্লেখ করেছেন ইহা সেই কামেল কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত। (সূরা বাকারা : ৩)

অর্থাৎ মুত্তাকীরা এমনই হয়ে থাকেন যে খোদার কিতাবই তাদের হেদায়াত দেয়। তাই তাদেরকে তেমন কোন সমস্যায় পড়তে হয় না।

'মুত্তাকী' আরবী শব্দ 'ওয়াকা' মূল ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে যার অর্থ হলো ক্ষতিকর কোন বস্তু থেকে বাঁচিয়ে চলা। 'ভিকায়া' শব্দের অর্থ বর্ম বা ঢাল (যা দিয়ে কোন কিছুকে আড়াল করা হয়)। ইত্তাকাবিহি-অর্থাৎ সে বর্ম বা ঢাল রূপে এটি গ্রহণ করে নিল। হযরত নবী করীম (সা.)-এর প্রিয় সাহাবী হযরত উবাইয়া বিন কাব (রাজি.) মুত্তাকী বিষয়ে বলেছেন, 'মুত্তাকী হলো সেই ব্যক্তি যে কাঁটা ভরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এমন সাবধানে অতিক্রম করে যাতে তার কাপড় কাঁটায় আটকিয়ে না যায় বা এদের শাখা-প্রশাখা লেগে কাপড় না ছেঁড়ে (ইবনে কাসির)। অতএব মুত্তাকী হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌কে ঢাল বা বর্ম বা আশ্রয় গ্রহণ করে অতি সাবধানে সর্বদা পাপ কর্ম থেকে আত্ম রক্ষা করেন এবং নিজ কর্তব্য সযত্নে পালন করেন। মুত্তাকি সম্পর্কে সঙ্গায়িত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "খোদা তাআলা বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে তার জন্য মুশকিল ও কাঠিন্য হতে মুক্তির পথ খুলে দেন। মুত্তাকি প্রকৃতপক্ষে সে, যে তার শক্তিসামর্থ অনুযায়ী তদবীর দ্বারা নির্ধারিত পথে কাজ করে।" (মলফুযাত, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৮)

মুত্তাকীদের গুণাবলী :

'মুত্তাকী বা খোদাভীরু ব্যক্তিবর্গের এমন কিছু গুণাবলী থাকে যা অন্যদের থেকে পৃথক করা সম্ভব। আল্লাহ্ তাআলা মুত্তাকীদের গুণাবলী উল্লেখ করে বলেন, (মুত্তাকী তারা) যারা গায়েবের উপর বিশ্বাস রাখে, নামায প্রতিষ্ঠা করে আর আমরা তাদের যা দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। (সূরা বাকারা : ৪) আবার সূরা তাগাবুনের ১৭ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে অর্থ সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে সাধ্যমত ভয় করো। এসব আয়াতে মুত্তাকীর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। একজন মুত্তাকী সে গায়েবের প্রতি ঈমান আনবে অর্থাৎ খোদা ও খোদার নির্দেশিত বিষয়ে ঈমান আনবে। আর নামায প্রতিষ্ঠা করবে। কোন অবস্থাতেই নিজেদের নামায ছুটে যাবে না বরং নিজ পরিবার ও জামা'তকে নামায প্রতিষ্ঠা করার জন্য সহায়তা দান করবেন। আর আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ থেকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির খাতিরে খরচ করে যাবে যেন আল্লাহ্র জামা'তের উন্নতি হয়।

মুত্তাকীরা সত্য কথা বলবে :

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং সঠিক কথা বলো।" এমন কথা বলতে বলা হয়েছে তা যেন সহজ সরল হয়। কোন বক্রতা বা মার-প্যাচ পরিলক্ষিত যেন না হয়। সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষা প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে। আর এমনটি করলে খোদা তোমাদের সংশোধন করে দিবেন এবং পুরস্কার দিবেন।

মুত্তাকীরা খোদার নির্দেশের সম্মানকারী হবেন :

যারা আল্লাহ্র রাহে মুত্তাকী তারা তাঁর চিহ্ন বা নিদর্শনসমূহের সম্মানকারী হবেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পাক কালামে বলেন, এটাই (গুরুত্বপূর্ণ কথা) আর যেই আল্লাহ্র নির্ধারিত পবিত্রতার প্রতীকসমূহের সম্মান করবে নিশ্চয় (তার এ কাজকে) অন্তরের তাক্ওয়া বলে গণ্য হবে। (সূরা হজ্জ : ৩৩)। এখানে একজন মুত্তাকীর আন্তরিক তাক্ওয়া সৃষ্টির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। একজন মুত্তাকী আল্লাহ্র সেই সমস্ত প্রতীক বা চিহ্নকে যেমন, বায়তুল্লাহ্ (আল্লাহ্র ঘর), আল্লাহ্র নবী-রাসূল ও কিতাবসমূহের প্রতি একই সাথে খোদার প্রেরিত বন্ধুদের প্রতি এই কারণে সম্মান করবে যে খোদা এসব পছন্দ করেন। আর এভাবে তার অন্তর খোদা প্রেমে বিমোহিত হতে থাকে।

মুত্তাকীদের ৪টি মহৎগুণ:

একজন মুত্তাকীর নানান গুণের মধ্যে নিম্নরূপ ৪টি গুণ তাকে উত্তম পরিণামের পথে প্রবহমান করবে আর এভাবে তিনি অমর হয়ে স্থায়ীত্ব লাভ করবে। আল্লাহ্ তাআলা ঐ গুণগুলিকে এভাবে চিহ্নিত করেছেন, আর তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করে, নামায কায়েম করে, আমরা তাদের যা-ই দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে এবং পুণ্যের মাধ্যমে পাপকে প্রতিহত করে। এদের জন্য রয়েছে পরকালে উত্তম পরিণাম (সূরা রা'দ : ২৩) এই আয়াত থেকে একজন মুত্তাকীর ৪টি মহৎগুণ প্রকাশিত হয়। প্রথমত: ধৈর্য ধারণ করা একজন মুত্তাকীর অনন্য বৈশিষ্ট। সকল অবস্থায় তাঁকে এ গুণের অধিকারী হতে হবে। খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে বিপদে আপদে ধৈর্যশীলতার পরিচয় তুলে ধরবেন। দ্বিতীয়ত: নামায প্রতিষ্ঠাকারী হিসাবে তিনি ও তার অধীনস্তদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবে যেন নামায ছিটকে না পড়ে। তৃতীয়ত: খোদা প্রদত্ত সম্পদ থেকে খোদার খাতিরে কোন কোন সময়ে গোপনে এবং কোন কোন সময়ে প্রকাশ্যে দান করবে যেন লোকেরা দেখে অনুপ্রাণিত হয়। চতুর্থত: পাপ কাজ কোন সময় যদি আক্রমণ করতে আসে তবে পুণ্যকর্ম দ্বারা পাপকে বিদূরিত করবে যেন পাপ ধারে কাছেও আসতে না পারে আর এভাবে পরকালের পরিণাম উত্তম হতে উত্তম বানানোর চেষ্টা করে যাবে।

মুত্তাকীদের রিযিকের অভাব হয় না :

মুত্তাকীগণ যেহেতু খোদার পথের পথিক তাই মুত্তাকীদের রিযিক খোদা প্রদান করে থাকেন। সকল নবী-রাসূলগণ এমন কথাই বলেছেন, অতএব তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার অনুসরণ কর। আর আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদানতো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃত প্রতিদান প্রদানের মালিক তো মহান প্রভুপ্রতিপালক তিনি আল্লাহ্। (সূরা শোয়ারা : ১৬৪-১৬৫)

মহান আল্লাহ্ তাআলার বাণী : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন করে চলে আল্লাহ্ তার মুক্তির পথ বের করে দেয় এবং যে সম্পর্কে সে ধারণাও করেনি সেখান থেকে তার জন্য তিনি রিযিক দেন। (সূরা আত্তালাক : ৩-৪) এই আয়াত দ্বারা একজন মুত্তাকী খোদা প্রদত্ত রিযিক লাভ করে থাকেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর শুধু খোদা রিযিক দেন এমনই নয় বরং অনেক সময় কোথা থেকে তার রিযিক আসছে তিনি নিজেও ধারনা করতে পারে না। এজন্য একজন মুত্তাকী বস্তুজগতের মনিবের কাছে রিযিক প্রার্থনা করে না বরং খোদার নিকট রিযিক প্রত্যাশা করে।

খোদার কাছে সবচেয়ে সম্মানীত হল মুত্তাকীরা :

মুত্তাকীরা খোদার সম্মানীত বান্দা। আল্লাহ্র রাসূল (সা.)-কে সাহাবী (রাজি.) জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, মান আকরামুন্নাছি? কালা আত্কাহুম।" অর্থাৎ হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? হযরত রাসূল (সা.) বলেছেন তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে মুত্তাকী। (বুখারী ও মুসলমি শরীফ)। আল্লাহ্ তাআলার বাণী হলো, তোমাদের মাঝে আল্লাহ্র দৃষ্টিতে নি:সন্দেহে সেই সর্বাধিক সম্মানীত যে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মুত্তাকী। (সূরা হুজুরাত : ১৪) এভাবে সূরা আ'রাফের ২৭ আয়াতে বলা হয়েছে– আর তাক্ওয়ার পোশাক হলো সর্বোত্তম।

খোদার বাণী অনুযায়ী তাক্ওয়া অর্জনকারী বা খোদাভীতি যারা অর্জনকারী তারা মুত্তাকী আর মুত্তাকীরা খোদার নিকট সম্মানীত। এ বিষয়ে আরো বলা হয়েছে, স্মরণ কর সেদিনকে যেদিন আমরা মুত্তাকীদের একত্র করে রহমান (আল্লাহ্র) দিকে একটি (সম্মানীত) দল হিসাবে নিয়ে যাওয়া হবে। (সূরা মরিয়ম : ৮৬)। কিয়ামতের দিন মুত্তাকীদের দলকে সম্মানীত দল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই আমাদেরকে মুত্তাকী দলে শামিল হওয়া উচিত।

মুত্তাকীরা জান্নাতি হবে :

মহান আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি হাসিল করে মুত্তাকীগণ পরম সৌভাগ্যের স্বর্ণ-শিখরে অর্থাৎ জান্নাত লাভ করবে। কুরআন পাকে আল্লাহ্ তাআলার ঘোষণা মুত্তাকীদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এ দৃষ্টান্ত হলো (এমন যে) এর পাদদেশ দিয়ে নদ-নদী বয়ে যায় এর ফলফলাদি এবং ছায়া চিরস্থায়ী। যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করেছে এ হলো তাদের পরিণাম এবং কাফিরদের পরিণাম হবে আগুন। (সূরা আর রা'দ : ৩৬)

আরো বলা হয়েছে, নিশ্চয় মুত্তাকীরা ছায়া ও ঝরণা (ঘেরা জান্নাতে) থাকবে এবং তাদের পছন্দনীয় ফলফলাদির মাঝে থাকবে। তাদের বলা হবে তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিদান রূপে তৃপ্তির সাথে খাও এবং পান কর। নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণদের এভাবেই আমরা প্রতিদান দিয়ে থাকি। (সূরা মুরসালাত : ৪২-৪৫)

উল্লেখিত আয়াতে কারীমায় মুত্তাকীদের শুভ পরিণয়ের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। তাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে চলুন আমরা তাক্ওয়াশীল হয়ে যাই। যেন শেষ বিচারের মজলিসে খোদার সন্তুষ্টি নিয়ে জান্নাত লাভ করতে পারি।

আমাদের প্রাণ প্রিয় হুযূর (আই.) আমাদেরকে তাক্ওয়া বা খোদাভীতির মাধ্যমে আমলের উন্নতি করতে বলেছেন, তিনি (আই.) বলেন, ".......আজ আমাদের খোদাভীরুতার প্রয়োজন। খোদাভীরুতা অর্জনের জন্য প্রত্যেকের উচিত অনুশোচনা করা, খোদার সমীপে নত হওয়া এবং তাক্ওয়ার পথ অবলম্বন করা। আর তাক্ওয়ার পথ অবলম্বন কেবল তখনই সম্ভব যখন আল্লাহ্র সাথে আমরা প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবো। (খুতবা জুমুআ, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১১)

সবশেষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি পংক্তি উল্লেখ করছি–তিনি (আ.) লিখেছেন 'ওহ খোদা ছে দূর হ্যায় জো তাক্ওয়া ছে দূর হ্যায়'–অর্থ সে-ই খোদা থেকে দূরে যে তাক্ওয়া থেকে দূরে।

তাই আসুন আমরা তাক্ওয়াশীল হয়ে খোদার নিকটস্থ হই। আর এভাবে খোদার সন্তুষ্টির জান্নাত লাভ করি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের এমনটিই বুঝিয়েছেন, "......আমি খুব চিন্তা করে দেখেছি যে, খোদা তাআলার দরবারে যে সম্মান লাভ করা যায় এর আসল কারণ তাক্ওয়াই। যে মুত্তাকী সে জান্নাতে যাবে। খোদা তাআলা তার জন্য ফয়সালা করে ফেলেছেন খোদা তাআলার নিকট মুত্তাকীরাই সম্মানীত।" (মলফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৩)। প্রিয় পাঠকগণ! এখন আমাদেরকে খোদার সম্মানীত বান্দা হতে হলে অবশ্যই তাক্ওয়াশীল হতে হবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর তাক্ওয়াশীল বান্দা হওয়ার তৌফিক দিন। আমীন, সুম্মা আমীন।

প্রবাসীদের কলাম

স্মৃতির পাতা থেকে-

জলসা- ইজতেমার বরকত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

ফরিদ আহমদ, Chino, California, U.S.A

আমার 'আহমদীয়াত' বা 'আহমদী' সম্পর্কিত কিছু লিখার আগে নিজের সম্বন্ধে একটু ফিরিস্তি লিখতে হচ্ছে এজন্য যে, আহমদীয়াতে আমি নিতান্ত নতুন না হলেও এই জামা'তে অর্থাৎ বিরোধীদের দ্বারা কথিত 'কাদিয়ানী' বা 'রাবওয়া' জামা'তে আমি আগন্তুক অবশ্যই, ভুঁইফোড়ও বলতে পারেন। কারণ এই জামা'তের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমার বাপ দাদার নাম নেই, জন্ম সূত্রে আমি আহমদী নই। আমার বংশে, আমার জন্মস্থানের ১৫ মাইল ব্যাসার্ধ এলাকায় প্রথম সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আমি–ইসলামে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় আমি এখন আহমদী মুসলমান।

আমি 'বয়আত' নিয়েছি ১৯৭৪ সনে। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো তার নিজস্ব রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা হাসিলের স্বার্থে দেশ ও জনগণের স্বার্থকে জবাই করে যখন আহমদীদেরকে ('Not' Muslim) অর্থাৎ 'মুসলিম নয়' বলে সরকারী ভাবে ঘোষণা দিলেন তখন চট্টগ্রামের চকবাজার আহমদীয়া মসজিদে সরাসরি গিয়ে বয়আত নিয়েছিলাম আমি, সেদিন একা গিয়েছিলাম, কাউকে সাথী করে নেইনি।

দিন, মাস এখন এই বুড়ো বয়সে মনে করতে পারছি না, তখন মরহুম গোলাম আহমদ খান (ফালু মিয়া) ছিলেন জামা'তের প্রেসিডেন্ট। চট্টগ্রামে এমারত তখনও হয়নি। তার হাতেই বয়আত নিয়েছিলাম। তিনি আমাকে মসজিদ থেকে হাত ধরে নিজ বাসায় নিয়ে গেলেন এবং নিজ হাতে পাকা আম কেটে খাওয়ালেন–বেশ মিষ্টি আম। সুতরাং বয়আত নিবার পর পরই যখন স্থানীয় গাছের পাকা আম খেয়েছি, তখনকার দিনগুলিকে ধরে নিতে হবে জ্যৈষ্ঠ মাসের কোন একদিন অর্থাৎ জুলাই মাসই হবে।

ইতিমধ্যে অনেক বছর গড়িয়ে গেছে। জন্মভূমি ছেড়ে পশ্চিমা দেশে এসে অভিবাসন নিয়েছি। বাংলাদেশে বা আমেরিকায়, আহমদী সমাজে থাকা অবস্থায় যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে নিতান্ত অপ্রতুল নয় বলে মনে করি। এখন আমার বয়স ৭৮ বছর পার। আসল বয়স বেশীও হতে পারে। কারণ সমসাময়িক অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক ভাগ্যবান ব্যক্তিত্ব ছাড়া আমার শ্রেণীর সাধারণ মুসলমানের গাছ-পাথর আছে বলে আমার জানা নেই। স্ত্রী বয়আত নেয় আমার আরো ৪ বছর পর–১৯৭৯ সনের জানুয়ারীর শেষের দিকে। ১৯৭৮ সনে ডিসেম্বর মাসে মহররমের সময় দিল্লী ও আজমীর শরীফ ঘুরে কাদিয়ান গিয়ে জলসা সালানা দেখে দেশে ফিরে এসে বয়আত নিয়ে নেয় তার ছোট ভগ্নিপতি মির্যা মোহাম্মদ আলীও।

আহমদী হওয়ার পর মাসে মাসে নির্ধারিত হারে চাঁদা দিয়েছি, অদ্যাবধি তাই করে যাচ্ছি এবং সব রকমের তাহরীকে সাধ্যানুযায়ী আর্থিক কুরবানীতে শরীক হতে চেষ্টা করেছি। আলহামদুলিল্লাহ্। টাকার অংক হয়ত কম–তখনও ছিল, এখনও আছে। আল্লাহ্ তাআলা এখনও পর্যন্ত ঋণমুক্ত রেখেছেন। ফেৎনা-ফাসাদ বালাই মুক্ত রেখেছেন, ইতিমধ্যে পরিবার পরিজনসহ দু'বার রাবওয়া ও চারবার কাদিয়ানের জলসা সালানায় শরীক হতে আল্লাহ্ তাআলা সাহায্য করেছেন।

আর নিজ দেশের জলসা, ইজতেমাগুলিতো আছেই। বিশেষত: ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত জলসা, ইজতেমা ও ছোট বড় সম্মেলনগুলি নিতান্ত অপারগতা ছাড়া বাদ দিয়েছি বলে মনে হয়না। ১৯৯২ সালের ৩০ জুন হতে আমেরিকায় অভিবাসনে আসার পরেও তা বন্ধ থাকেনি।

বার্ধক্যজনিত পারিবারিক ও আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে, আল্লাহ্ তাআলা যখনই শক্তি, সামর্থ ও সুযোগ দিয়েছেন তখনই ডালাস লসএঞ্জেলেস, হিউস্টন সান হোজে, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, লন্ডন, জার্মানী, বেলজিয়াম ও কানাডার জলসা ইজতেমাগুলিতে যোগ দিয়েছি। ১৯৭৯ সনের মার্চ মাস হতে ২০১০ সনের জুন মাস পর্যন্ত সময়ের ভিতর ৮/১০ বার মক্কা মদীনা উমরা জিয়ারত করেছি এবং ১৯৮৪ সনে আরব দেশে চাকুরীকালীন সময়ে পবিত্র হজ্জব্রত পালন করার সৌভাগ্য হয়েছে এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই হজ্জ বা উমরা বা জিয়ারতগুলিতে আমার কোন টাকা পয়সা খরচ হয়নি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। সারা জীবন চাকুরী করেই এসেছি–সরকারী, আধাসরকারী ও বেসরকারী, দেশে ও বিদেশে এবং এখানে আমেরিকায়ও ছুটি ছাটা পেতে বাধা-বিপত্তি বেশী কিছু হয়নি, আলহামদুলিল্লাহ্।

জলসা, ইজতেমা অর্থাৎ জামা'তী কার্যক্রমগুলিতে শরীক হওয়া এবং নির্দ্ধারিত হারে জামা'তী চাঁদা দেওয়া ইত্যাদি আর্থিক কুরবানীতে শরীক হওয়ার ফলাফল আমি অধম হাতে হাতে পেয়েছি। জলসা, ইজতেমা বা জামা'তী কার্যক্রমে যখনই অংশগ্রহণ করেছি তখনই শারীরিক, আর্থিক বা অন্যান্য ব্যবস্থা যখনই যা প্রয়োজন হয়েছে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অশেষ বরকত ও ফজল দ্বারা তা পুরো করে দিয়েছেন–ভাবতেও এখন নিজের কাছে কেমন আশ্চর্য লাগে!

তাই মনে করলাম জলসা ইজতেমাগুলিতে অংশগ্রহণের ভিতর দিয়ে আহমদী জীবন আমার যা কিছু সামান্য অভিজ্ঞতা হয়েছে তা নিয়ে আমি কিছু লিখতে চেষ্টা করি। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে আমি লিখতেই জানি না। চাটগাঁয়ের লোক আমি–গ্রামীন পরিবেশে আমার জন্ম ও উত্থান, বাংলা ভাষায় জ্ঞানও আমার স্বল্প তাই লেখায় অনেক গুরুচন্ডালী দোষ থাকাও বিচিত্র নয়। তা সত্ত্বেও পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআলার নাম নিয়ে লিখছি।

১৯৭৭ সনে, অর্থাৎ আমার আহমদীয়াতে প্রবেশের চতুর্থ বছরে ইচ্ছা হল আমি পাকিস্তানের রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত আহমদীয়াতের আন্তর্জাতিক জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করি। ইতিমধ্যে আমি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত জলসা সালানা ও আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমাগুলিতে যোগ দিয়েছি। নিজের অনেক অজ্ঞতা সত্ত্বেও যথাসম্ভব শরীক হতে চেষ্টা করেছি। সম্মেলনগুলিতে ব্যবস্থাপনা, নিয়মানুবর্তিতা, অংশগ্রহণকারীদের আদব-কায়দা, ধর্মের

এক-একটা বিষয়ের উপর বিজ্ঞান ও বাস্তব ভিত্তিক আলোচনা পরস্পর মতবিনিময় ভ্রাতৃত্বসম্পর্ক ইত্যাদি দেখে ও অভিজ্ঞতা লাভ আমার খুবই ভাল লাগত এমনকি আমাকে এক নতুন জগতের সন্ধান দিল। তাই ভাবলাম, আহমদীয়াতের প্রাণকেন্দ্র রাবওয়ায় আহমদীয়া জামা'তের লোকেরা কি করে, একবার নিজের চোখে দেখি।

যা হোক আমি এই নিয়্যতে বছরের শুরু থেকেই একটু-একটু করে তিন হাজার টাকা সঞ্চয় করলাম–দুই হাজার টাকা দিয়ে ঢাকা-করাচী প্লেন টিকেট আর বাকী এক হাজার টাকা দিয়ে করাচী- রাবওয়া লাহোর যাওয়া আসার রেলভাড়া, হাত খরচ ইত্যাদি। যেহেতু আমরা জলসায় বিদেশী মেহমান, তাই করাচীতে প্লেন থেকে নামার পর হতে ফিরতী প্লেনে উঠার আগ পর্যন্ত সময়ে থাকা খাওয়ার ব্যায়ভার ওখানকার স্থানীয় জামা'তের দায়িত্বে থাকবে শুনলাম। আমার জলসায় যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের স্থানীয় চট্টগ্রাম জামা'তে এবং জুমুআর দিনগুলোতে এলান দিয়ে সবার কাছে দোয়ার আবেদন জানালাম, এতে প্রেসিডেন্টসহ জামা'তী ভাই বোন সবাই খুব খুশী এই বলে যে, দেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রের জলসায় শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা দু'জনই (অর্থাৎ আমি ও তদানিন্তন ন্যাশনাল আমীর : মরহুম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব) সর্বপ্রথম বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তান সফর করতে যাচ্ছি।

এই দিনগুলিতে আমি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে জাহাজ চলাচল বিভাগে কর্মরত ছিলাম। আমার পদবী ছিল : লাইটিং অফিসার। জলসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে ভিসা সংক্রান্ত কাজের জন্য ছুটি নিয়ে ঢাকায় আসি। থাকার জন্য বকশী বাজার আঞ্জুমানে উঠলাম এবং রাত্রে আমীর সাহেবের সাথে দেখা করে জলসায় যাত্রা নিয়ে আলাপ আলোচনা করলাম। আমীর সাহেব মোকাররম ইসমত পাশাকে (বর্তমানে কানাডায়) ডেকে পরদিন সকালে আমাকে সাথে করে মন্ত্রণালয়ে নিয়ে যেতে বললেন।

মন্ত্রণালয়ে, এ টেবিল, ও টেবিল, ওই চেয়ার, ফাইল নিয়ে ঘুরাঘুরি করে অবশেষে ছাড়পত্র বের করতে বুধবার প্রায় ১১টা বাজে। তারপর দৌড়ে আমীন মোহাম্মদ ফাউন্ডেশন বিল্ডিংএ পাকিস্তান এমবিসিতে গিয়েই দেখি ভিসা অফিস ফাঁকা, লোকজন নাই। ভিসা ইস্যু বন্ধ। রিসিপশনের ভদ্র মহিলা আমাকে জানালেন যে, ১৫ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৭ তারিখ পর্যন্ত ভিশা অফিস বন্ধ থাকবে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানালেন, বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে পাকিস্তান সফরে থাকবেন। সেহেতু নিরাপত্তার খাতিরে ভিসা দেওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।

শুনে মাথায় বাজ, বড় হতাশায় পড়ে গেলাম। আমার নিজের উপরই রাগ হল। কেন ১৫ তারিখে ভিসা নিতে এলাম না, ছুটি নিলাম , সরকারের ছাড়পত্র নিলাম, জলসা শুরু হবে ২৬ তারিখ বিমানের ২২ তারিখের ফ্লাইটের জন্য টিকেট কিনেও রেখেছি যাতে ২৩ তারিখের বিকেল বেলা করাচী থেকে লাহোরগামী ট্রেনে জলসাযাত্রী কাফেলায় শরীক হয়ে ২৪ তারিখ সকাল বেলায় রাবওয়া পৌঁছুতে পারি। সব ঠিকঠাক। কিন্তু যাওয়া আর হলো না।

ফিরে এসে আমীর সাহেবকে সবকিছু জানালাম এবং বললাম যে, আমার সাময়িক ছুটি আগামী কাল শেষ হতে যাচ্ছে। তাই চলে যেতে অনুমতি চাইলাম, যাতে আমি শনিবারে কাজে যোগদান করতে পারি। শান্তনা দিয়ে আমীর সাহেব বললেন, "ধৈর্য ধরে দোয়া করতে থাকুন, আল্লাহ্ তাআলা যেকোন একটা উপায় অবশ্যই বের করে দেবেন, দেখুন কি হয়।" রাতে তিনি অনেক জায়গায় ফোন করলেন, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেবকে কোথায় কোথায় পরদিন যেতে বললেন। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে ফজর নামাযের পর আমীর সাহেবের সাথে দেখা হতেই আমাকে বললেন, "আরও দুই রাত্রি ঢাকায় থেকে যান। শনিবার সকাল ৯টার দিকে পাসপোর্ট, কাগজপত্রসহ পাকিস্তান দূতাবাসে গিয়ে কাউকে কিছু না বলে, সরাসরি গোলাম রব্বানী সাহেবের সাথে দেখা করবেন। গোলাম রব্বানী সাহেব খুব বড় অফিসার।" বেশ কিছু চিন্তা-ভাবনার পর আরও দুই রাত্রির জন্য ঢাকায় থেকে গেলাম।

শনিবার সকাল ৯টায় পাকিস্তান দূতাবাস গেলাম, ভিসা অফিস বন্ধ। লোকজন নাই। রিসিপশনে মহিলাকে নিজের নামের পরিচয় দিয়ে বললাম "I have come to see Mr Ghulam Rabbani, on pre appointment". গোলাম রব্বানী সাহেব তখন ঢাকাস্থ পাকিস্তান এমবিসিতে First Secretary উনার পদবী ছিল Minister অর্থাৎ এমবেসাডোর এর পরবর্তী প্রথম নিম্ন পদটি ছিল উনার। স্লিপ পাঠিয়ে দেওয়ার পর পরই আমার ডাক এল। ভিতরে ঢুকে আচ্ছালামু আলাইকুম সম্ভাষণ দিতেই ছালামের জওয়াব দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে পাশের চেয়ারে নির্দেশ করে আমাকে বসতে অনুরোধ করে জানতে চাইলেন, কেন বছরের ঐ নির্দিষ্ট সময়ে আমি পাকিস্তান যেতে চাই।" "সামনের সপ্তাহে অর্থাৎ ডিসেম্বর ২৬ হতে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিতব্য জলসা সালানায় আমি শরীক হতে ইচ্ছুক"। ইংরেজীতেই আমাদের আলাপ হচ্ছিল। তিনি বললেন, "আমরা কোন জলসা বা এ সম্বন্ধীয় কোন কিছুর ব্যাপার নিয়ে ভিসা ইস্যু করি না। আপনি অন্য কিছু কারণ দেখাতে পারেন যেমন কোন ব্যবসা বাণিজ্য ঘটিত ব্যাপার বা পর্যটন, পরিভ্রমণ বা কোন আত্মীয় স্বজনের বা ভাই, বন্ধুর সাথে দেখা করা এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে কোন আমন্ত্রণের কাগজপত্র। যাক পাকিস্তানে এখন এমন কে আছে যে আপনাকে Sponsor করতে পারে?"

আমি সরকারী চাকুরী করি। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে রত। সরকারী পাসপোর্টে বিদেশে যাচ্ছি। ব্যবসা বাণিজ্য বা এরূপ কোন আত্মীয়রা পাকিস্তানে আমার নেই যারা আমার জন্য Sponsorship দিবে। তবে হ্যাঁ, লাহোর শহরে এক পরিবার আছে যারা আমার পারিবারিক সম্পর্কিত আত্মীয় স্বজনের চাইতেও বেশী। তারা হলেন মরহুম লে: কমান্ডার মরগুব আলম সাহেবের পরিবার। থাকেন নিউ গার্ডেন টাউন এলাকায়।

আমি তাঁদের কাছে চিঠি লিখেছিলাম, এরকম কিছু আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাকে চিঠি লিখতে। এখনও আমি তাদের উত্তরের প্রতিক্ষায়। এর বাইরে তো আমি কিছু করতে পারি না স্যার। গোলাম রব্বানী সাহেব কিছু সময় চুপ করে রইলেন। কিছু একটা চিন্তা করলেন। তারপর ড্রয়ার খুলে একটা Visa application Form বের করে আমার হাতে দিলেন ইংরেজী বড় অক্ষরে পূরণ করতে। ফরমে ছাপা এবং লাইন অনুসরণ করে প্রথম লাইনে লিখলাম আমার নাম "ফরিদ আহমদ" তিনি এক দৃষ্টে আমার লেখার দিকে দেখছিলেন। দ্বিতীয় লাইনে লিখলাম পিতার নাম : মরহুম চৌধুরী গোলাম রছুল" নীরবতা ভংগ করে রব্বানী সাহেব বলে উঠলেন আশ্চর্য আমার পিতার নামও চৌধুরী গোলাম রছুল । আমি মাথা নীচু করে লিখে যাচ্ছিলাম। এ ব্যাপারে এমন কিছু চিন্তা ভাবনাও করিনি, কি জানি কেন।

হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে আপনা-আপনি বেরিয়ে এল নিতান্ত মামুলী ভাবেই–"ফির হাম দুনো ভাই হো সাকতে হেঁ, স্যার। যিসমানী অগর নেহি হোঁ তো রূহানী জরুর হোঁ সেকতে হেঁ" (তা হলে আমরা দুজন ভাই হতে পারি, স্যার। বাস্তবে যদিও না হই, রূহানী ভাই তো অবশ্যই হতে পারি)।

[চলবে]

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল **‘ইসলামে সামাজিক কদাচার পরিহার সম্পর্কিত শিক্ষা।’** পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

ইসলামে সামাজিক কদাচার পরিহার সম্পর্কিত শিক্ষা

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। আর ইসলাম মানবজাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষকে কিভাবে জীবন পরিচালনা করতে হবে-এর বিধি বিধান ইসলামে রয়েছে। ইসলাম পূর্ব জগতে আরবরা সব সময়ই ঝগড়া-বিবাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হত্যা ব্যভিচার তথা নানা প্রকার সামাজিক কদাচারে লিপ্ত থাকত।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে তারা একটি সভ্য, সুসংগঠিত, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, সম্প্রীতি ও ভালবাসা সামাজিক জীবনকে শান্তিময় করে তোলে। অন্যদিকে পারস্পরিক কলহ, হিংসা, বিদ্বেষ আমাদের জীবনকে বিষিয়ে তোলে। এ ধরনের আচরণ ইসলামের পরিপন্থী। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, “পরস্পর সৎ ইচ্ছা ও শুভ কামনাই দ্বীন।” তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি অন্যদেরকে ধোঁকা দেয় সে (জামা’তের) উপকারী সদস্য হতে পারে না।” (তিরমিযী)

অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সম্প্রতি আমাদের সমাজে চুরি, ডাকাতি, খুন, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী ইত্যাদি নিত্যনৈমত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুব সমাজ ঝুঁকে পড়েছে মাদকদ্রব্যের দিকে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে মাদকদ্রব্য হারাম ও মারাত্মক অপরাধ। মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, “অবশ্যই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা এবং লটারি অপবিত্র ও শয়তানের কাজ, অতএব, তোমরা তা থেকে দূরে থাকবে, যাতে সফলকাম হতে পার” (সূরা আল মায়িদা : ৯০)।

সামাজিক কদাচারের মধ্যে প্রতারণা অন্যতম, যা তাক্ওয়াপূর্ণ ইসলামী জীবন যাপনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়াও মানুষ অন্যান্য সামাজিক কাজেও প্রতারণা করে থাকে। প্রতারণা মিথ্যারই শামিল। কুরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছে, “তোমরা সত্যের সাথে অসত্যের মিশ্রণ ঘটিয়ো না এবং তোমরা জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।” (সূরা বাকারা : ৪২)

হিংসা, ফিৎনা-ফাসাদ, গীবত বা পরনিন্দার মত সামাজিক কদাচার আজকের সমাজে অহরহই ঘটছে। সমাজে বিশৃঙ্খলা ও ন্যায়নীতি বর্জিত কার্যকলাপ রোধের অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে, তাক্ওয়া বা খোদাভীতি। যে কেউ বাহ্যিকভাবে চরিত্রবান বলে অভিহিত হলেও অন্তরে তাক্ওয়া না থাকলে সত্যিকারভাবে সদগুণাবলীর অধিকারী হতে পারে না। যার অন্তরে তাক্ওয়া আছে, সে সবসময় আল্লাহ্‌র উপস্থিতি অনুভব করে। সে কোন পাপ করতে পারে না।

সুচিন্তিত ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং স্রষ্টা প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও জাতিকে উজ্জীবিত করার শক্তিশালী আদর্শ এবং ইসলামী শিক্ষাকে যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা সামাজিক কদাচার পরিহার করে সুশৃঙ্খল ও সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারি। মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন, আমীন।

ইসমত আরা চৌধুরী (ঊর্মি), চট্টগ্রাম

সকল প্রকার সামাজিক কুসংস্কার দূরীভূত করতে হবে

আমাদের সমাজে অনেক কুসংস্কার বা বিদাত প্রচলিত আছে। বিভিন্ন ছোট ছোট কুসংস্কার সমাজে প্রচলিত হয়ে আসতে আসতে তা সামাজিক রীতি এবং উৎসবে পরিণত হয়ে উঠছে। বিভিন্ন সামাজিক কদাচারের মধ্যে রয়েছে জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী পালন, তাবিজ-কবজ, ঝাড়-ফুঁক, বাটি চালান, বানমারা ইত্যাদি। এসব কিছুই কুসংস্কার এবং বিদাত। ইসলাম এসব সামাজিক কদাচার বা বিদাত থেকে দূরে থাকতে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে। ইসলাম কখনো সামাজিক কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয় না। এসব পাপকাজ থেকে আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা জানি, হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত হত্যা করা হতো আর এটাও তারা কুসংস্কারের বেড়াজালে জড়ানোর ফলেই করত। হযরত রাসূল করীম (সা.) চিরতরের জন্য এই জঘন্য কুসংস্কারকে নির্মূল করেছিলেন।

সামাজিক যে কুসংস্কারগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটি বড় আকারে দেখা যাচ্ছে আর তা হলো জন্মবার্ষিকী পালন। যা আজকাল বিভিন্ন ঘরে মহা ধুমধামে পালিত হতেও দেখা যায়। মহানবী (সা.) নিজে তাঁর জন্মবার্ষিকী কখনো পালন করেননি এবং তাঁর সাহাবীরাও তাঁর জন্মবার্ষিকী এবং মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছেন বলে কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। আমরা যেহেতু তাঁরই উম্মত তাই আমাদেরও নবী করীম (সা.)-এর পথ অনুসরণ করে জীবন পরিচালিত করা উচিত। আমরা যদি নবী করীম (সা.)-এর আদর্শ মোতাবেক জীবন পরিচালিত করি তবেই হবে আমাদের জীবন স্বার্থক। আমরা সমাজের অন্যান্য মানুষের ন্যায় দেখাদেখি এসব সামাজিক কদাচারে লিপ্ত হতে পারি না। কেননা আমরা শ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর উম্মত। তাঁর একনিষ্ঠ উম্মত হিসেবে আমাদের এসব কদাচার বা বিদাত থেকে দূরে থাকা দরকার।

দেখা যায় তাবিজ-কবজ ঝাড়-ফুঁকে অনেকেই আস্থা রাখে। তারা মনে করে এসবই নাকি জীবনের স্বস্থির মাধ্যম। এতে নাকি জীবনের যত সমস্যা আছে তা মিটে যায়। অথচ এসব জ্ঞানহীন মানুষের চিন্তাধারা তারা বোঝেনা যে এসব করে তারা কত বড় পাপ কাজ করছে। তাদের মধ্যে আল্লাহ্ ভীতি কমে যাওয়ার ফলেই এসবের দিকে ঝোকে। কিন্তু তারা বোঝেনা আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসাই সব কিছুর মূল। আল্লাহ্ তাআলার কাছে জীবনের যত সমস্যা আছে সবকিছু থেকে উত্তোলনের জন্য দোয়া করাই যথেষ্ট। তিনি বান্দার বিগলিতচিত্তের দোয়া সহজেই কবুল করেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদের নানা সমস্যা দিয়ে পরীক্ষা করেন। তাই তিনিই এসব সমস্যা থেকে মুক্তির একমাত্র চাবিকাঠি। তাঁর কাছেই যদি আমরা দোয়া চাই তবেই সবকিছু থেকে মুক্তি পেতে পাড়ি।

একটা সাধারণ মানুষ কিভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত সমস্যাগুলোর সমাধান তাবিজ-কবজ আর যার-ফুঁকের মাধ্যমে করতে পারে? এটা কখনোই সম্ভব নয়। হাদীস পাঠে জানা যায়, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন,

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ধর্ম বিষয়ে বিদাত অর্থাৎ এরূপ কোন নতুন নিয়ম রীতি পয়দা করে যা ধর্মে অনুমোদিত নয়, তবে সেই রকম রীতি বাতিল এবং প্রত্যাখ্যানযোগ্য।" আমাদের সমাজে অনেক পাপাচার ও কদাচার চলে আসছে। যেমন হিংসা, রাহাজানি, খুন-খারাবী, লোভ-লালসা, ব্যভিচার, বিভিন্ন ধরনের পাপকার্য প্রভৃতি। এসব সমাজের ভীতকে নড়বড়ে করে দেয়। একটি সুন্দর সমাজ কাঠামো গড়ে উঠতে অনেকটা সময় পাড়ি দিতে হয় কিন্তু তা বিনষ্ট করতে বেশি সময় লাগেনা।

মহান আল্লাহ্ তাআলা এবং আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর শিক্ষা এই নয় যে, তোমরা সমাজে অপকর্ম ও পাপকাজ কর। আল্লাহ্ তাআলা ও হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর শিক্ষানুযায়ী চললে সমাজে এসব কদাচার আর থাকতো না। সমাজের মানুষ আজ আল্লাহকে ভুলে গিয়ে হিংসা-বিদ্বেষ ও লোভ-লালসায় এবং বিভিন্ন কু-প্রথায় নিজেকে নিমজ্জিত করে রেখেছে। কখনো কারো কোন কিছু দেখে হিংসা করা ঠিক নয়। নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'কারও দোষ খুঁজে বেড়িও না। গোয়েন্দাগিরি করো না, একে অন্যের প্রতি হিংসা করো না, বিদ্বেষ ও শত্রুভাব রেখো না। বরং তোমরা সবাই এক আল্লাহ্‌র বান্দা হয়ে ভাই ভাই হয়ে যাও।' (বুখারী, কিতাবুল আদব)

আমাদের সমাজে সামাজিক কদাচার বা বিদাতগুলো আমাদের নিজস্ব সৃষ্টি। তাই এগুলো থেকে আমাদের দূরে থাকার একমাত্র উপায় নবী করীম (সা.)-এর আদর্শ মতাবেক চলা এবং তাঁর আদেশ নিষেধ নিজেদের জীবনে প্রতিফলন ঘটানো। ইসলামে নতুন কোন চিন্তাধারার সংযোগ না করা। তাহলেই আমরা সামাজিক কদাচার মুক্ত থাকতে পারবো।

সকল প্রকার বিদাত, কুসংস্কার ও কদাচার থেকে জাতিকে উদ্ধারের জন্য পুনরায় আল্লাহ্ তাআলা এ যুগে একজন মহাপুরুষকে পাঠিয়েছেন, তাই সবার উচিত আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আগত মহাপুরুষকে মেনে নিয়ে সকল প্রকার কুসংস্কার ও কদাচার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী, তেজগাঁও, ঢাকা

মানবজাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হলো ইসলাম

ইসলাম ধর্ম ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার অনুমোদন ও উৎসাহ দান করে এবং যাবতীয় অকল্যাণজনক অহেতুক ও নোংরা কার্যকলাপকে নিষেধ করে। ইসলাম অনুমোদিত কোন আচার আচরণেই কোন প্রকার বাড়াবাড়ি নেই। খাদ্য, বাসস্থান শারীরিকসহ সব কাজেই পবিত্রতা, সংযম ও রুচিবোধকে সমুন্নত রাখতে বলে। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের যাবতীয় আচার আচরণে কোথাও নোংরামী, শঠতা, প্রতারণাকে প্রশ্রয় দান করে না।

ইসলাম যেমন হিতকর ও সুদূর প্রসারী কল্যাণকর আচার অনুষ্ঠান পালনে বাধা দেয় না তেমনি যাবতীয় অহিতকর ও সমাজে যার ফলে পঙ্কিলতার, কার্যকারিতার প্রসার ঘটে তা কঠোর ভাবে পরিহার করে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার ডান কানে আযান ও বা কানে ইকামত দেওয়া হয়। বরকে অলিমার ব্যবস্থা করতে হয়। স্ত্রীকে বাধ্যতামূলক মোহরানা দিতে হয় তবে তা স্বামীর সামর্থানুযায়ী। ইসলামী যাবতীয় কদাচার পরিহারে বিশেষ গুরুত্ব ও সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে।

এমনকি প্রতি জুমুআর নামাযের দ্বিতীয় খুতবা পাঠ করা হয়, "নিশ্চয় আল্লাহ্ আদেশ দেন ন্যায় বিচার এবং অনুগ্রহ করার জন্য। আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য এবং আল্লাহ্ নিষেধ করেন অশ্লীল কথা বলতে, অসঙ্গত কাজ ও বিদ্রোহ করতে"। খুতবায় বর্ণিত এ সবই কদাচার থেকে বাঁচার নির্দেশনা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুসলিম সমাজেও আজ যে কিভাবে অনাচার প্রবেশ করেছে তা বর্ণনা করতে গেলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখেও শেষ করা যাবে না। যৌতুক আজ মারাত্মক সামাজিক ব্যধি যার অনুমোদন ইসলামে নেই। মোল্লারা ইসলামের সুন্দর শিক্ষাকে বিকৃত করে আবিষ্কার করেছে হিল্যা শরার মত নোংরামীকে, মোটকথা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি আজ ইসলামী সমাজেও শত শত কদাচার দানা বেধে বসেছে। পীর পূজা, কবর পূজা, উপাসনার নামে জানা অজানা নৃত্য এবং অসংখ্য বিদাত ও শিরকের মধ্যে আপদমস্তক ডুবে আছে প্রায় গোটা সমাজই।

অনেক এমন নারী আছেন যারা সঠিক ভাবে পর্দা করে চলেন না অথচ ইসলামে পর্দার গুরুত্ব অপরিসীম। চুরি, রাহাজানি, জুয়া, মদপান ছিনতাই, ব্যভিচার, প্রতারণা, অশ্লীলতা, বিদ্রোহ, অবিশ্বস্থতা, পরকীয়া, ঘুষ যুলুম-নির্যাতন, দুর্নীতি, ব্যবসায় অসাধুতা, ওজন ও মাপে কম দেওয়া অযথা অপবাদ দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য, ওয়াদা ভঙ্গ, স্বজনপ্রীতি, খেয়ানত, জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে ব্যক্তি স্বার্থকে প্রধান্য দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় অপকর্মই কদাচার ও ইসলাম গর্হিত কাজ। এসব কদাচারের বিরুদ্ধে ইসলামের দৃঢ় অবস্থান। স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি অবিশ্বস্থতা, স্ত্রী নির্যাতন, স্বামীর প্রতি দুর্ব্যবহার সামাজিক কদাচার। এসব ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলাম শান্তি, সুবিচার, পরস্পর সহানুভূতি, বিপদে একে অন্যের কাছে এসে দাঁড়ানোর শিক্ষা দেয়। আমরা যদি ইসলামের এসব দিক নির্দেশনা মেনে চলি তবেই সমাজ থেকে যাবতীয় কদাচার দূর করা সম্ভব হবে। যেহেতু ইসলাম বিশ্ব জনীন ধর্ম। অতএব এ শিক্ষা শুধু মুসলমানদের জন্যই সীমাবদ্ধ নয় বরং সমগ্র বিশ্বের জন্যই প্রযোজ্য।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর, হবিগঞ্জ

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'র 'নবীনদের পাতা'র পাশাপাশি প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**।

প্রতি সংখ্যার পাঠক কলামে লিখার জন্য একটি নির্দ্ধারিত বিষয় উল্লেখ থাকবে।

এবারের পাঠক কলামের বিষয় **'আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আহবানের গুরুত্ব'**।

আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

লেখা পাঠানোর আগে মনে রাখবেন- লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।

লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ জুলাই ২০১১-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

بسم الله الرحمن الرحيم

এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও

সার্কুলারঃ এমটিএ/বাংলা/০০১/২০১১-১২; জুন ২৬ ২০১১

এমটিএ দেখুন নিজের ও পরিবারের হেফাজত করুন

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বর্তমান অবক্ষয় ও অশান্তির যুগে এমটিএ আমাদের জন্য রক্ষাকবজ স্বরূপ। যুগ খলীফার (আই.) তাজা খুতবা ও সময়োপযোগী দিক নির্দেশনা এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার পাশাপাশি সমসাময়িক সকল সমস্যার সমাধানে এমটিএ অহরাত্র নিয়োজিত রয়েছে। সারা বিশ্বের কল্যাণ ও মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে, বিশেষ করে আহমদী সমাজের তরবিয়ত ও দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে আমাদের প্রয়াত ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর স্বহস্তে সূচিত এমটিএ আজ ৫ম খিলাফতের যুগে বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়েছে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও একটি আরবী চ্যানেলসহ বর্তমানে তিনটি স্বতন্ত্র চ্যানেলের মাধ্যমে এমটিএ বিশ্বের নানা ভাষায় দিন-রাত বিরতীহীন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে চলেছে। এমটিএ বিশ্বের সর্বপ্রথম স্যাটেলাইট ভিত্তিক ইসলামী টেলিভিশন চ্যানেল।

আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এমটিএ-এর দর্শক বৃদ্ধি এবং যুগ খলীফার জুমুআর খুতবা সহ নিয়মিত এমটিএ দেখার জন্য বার বার উপদেশ প্রদান করছেন। সাম্প্রতিক কালে মরকজ থেকে আগত হুযূরের (আই.) দু'জন সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মওলানা মুবাশ্বের আহমদ কাহলুন এবং মোহতরম চৌধুরী মোবারক মোসলেহউদ্দিন সাহেবানও এবিষয়ে বাংলাদেশ জামা'তকে বিশেষ তাগিদ প্রদান করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলার ফজলে সারা বাংলাদেশে জামা'তী ও ব্যক্তিগত মোট ২৬২টি ডিশের মাধ্যমে প্রায় ৬৬০টি স্থানে এমটি এ-এর সংযোগ চালু রয়েছে। এমটিএ বাংলাদেশ নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ডিশগুলো চালু রাখার বিষয়ে সচেষ্ট রয়েছে এবং নিয়মিত ভাবে রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা করছে। সম্প্রতি নতুন কিছু কর্মীকে ডিশ স্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং বিগত এক বছরে প্রায় ১০ জন নতুন কর্মী এমটিএ ক্যামেরা টিম এ যোগ দিয়েছে। কিন্তু তারপরও এসব আয়োজন প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল্য। আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যাতে অবস্থার উন্নতি সাধিত হয় এবং সেজন্য সবার কাছে দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি।

এখন আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর নির্দেশ বাস্তবায়ন ও এমটিএ-এর দর্শক বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাকসার সবার সহযোগিতা কামনা করছি এবং সে লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন ও দৃষ্টি প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

১) নিয়মিত এমটিএ দেখাকে অভ্যাসে পরিণত করুন।

২) প্রতি শুক্রবার গ্রীষ্ম সময় (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা এবং শীতকালীন সময় (অক্টোবর-মার্চ) সন্ধ্যা ৭ টায় হুযূরের (আই.) জুমুআর খুতবা সরাসরি (LIVE) দেখুন। সেদিন রাত ১০টার পর উক্ত খুতবা পুন:প্রচারিত হয়ে থাকে।

৩) প্রতি শনিবার বেলা ৩-৫০, রবিবার রাত ৮-১৫ এবং বহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় হুযূরের (আই.) বিগত জুমুআর খুতবার রেকর্ড আবারো প্রচারিত হয়।

৪) প্রায় প্রতিদিনের বেলা (সাধারণত: সকালের এবং দুপুরের দিকে) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর বিভিন্ন অনুষ্ঠান: যেমন-কুরআন ক্লাস, মোলাকাত, প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান, লেকা মা'আল আরব ইত্যাদি পুন:প্রচারিত হতে থাকে। এসব অনুষ্ঠানের বাংলা ডাবিং রয়েছে। (সাধারণতঃ সোমবার ও বুধবার সকাল ৭-৩০, মঙ্গলবার বেলা ৩-০০, বুধবার সকাল ১০-০০, বেলা ৩-০০, বৃহস্পতিবার রাত ৮-০৫ উক্ত অনুষ্ঠানসমূহ প্রচারিত হয়।)

৫) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর "ওয়াকফে নও"-দের সাথে অনুষ্ঠান সাধারণতঃ সপ্তাহে শনিবার, রবিবার রাত ৯টার পর, সোমবার বেলা ১-৪০, বুধবার বেলা ২-০০, বৃহস্পতিবার বেলা ১২-২৫ এ প্রচারিত হয়।

৬) Faith Matters: ইংরেজীতে আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান, রবিবার সকাল ১০টার পর, বেলা ২টার পর, রাত ১০-৩০, বৃহস্পতিবার বেলা ২-০০, রাত ১০-৫৫ এ প্রচারিত হয়ে থাকে। ইংরেজী শিক্ষিতদের জন্য এটা একটি আকর্ষণীয় উচ্চারণের অনুষ্ঠান।

৭) Real Talk: প্রতি শুক্রবার রাত ৯-২৫। এটি ইংরেজী শিক্ষিত ও আধুনিক তরুন সমাজের জন্য একটি আকর্ষণীয় শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান।

৮) আন্তর্জাতিক জামা'ত সংবাদঃ শনিবার, সোমবার বেলা ১২-৩০, সন্ধ্যা ৬-১০। এতে সারা বিশ্ব থেকে প্রাপ্ত আমাদের জামা'ত সমূহের কার্যক্রমের সচিত্র সংবাদ প্রচারিত হয়ে থাকে।

৯) রাহে হুদাঃ শনিবার, সোমবার, মঙ্গলবার রাত ১০-২০, শুক্রবার বেলা ২-৩০/২-৫৫। উর্দু ভাষায় "সত্যের সন্ধানে" এর অনুরূপ একটি অনুষ্ঠান।

১০) (LIVE) নযমের অনুষ্ঠান **"ইন্তেখাবে সুখান"**-প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬-৫৫।

১১) আমাদের বাংলা সম্প্রচার: প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭-০০। ব্যতিক্রম: শুক্রবার রাত ৮-১৫, শনিবার ৭-৫৫, বুধবার ৮-২০। এই অনুষ্ঠানে প্রতি বৃহস্পতিবার হুযূর (আই.) প্রদত্ত পূর্ব-সপ্তাহের জুমুআর খুতবার বঙ্গানুবাদ, শুক্রবার ও রবিবার কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান: আপত্তিসমূহের খন্ডন। বাকী ৪ দিন (শনি, সোম মঙ্গল ও বুধ) বাংলাদেশ ষ্টুডিও-র অনুষ্ঠান।

১২) "সত্যের সন্ধানে"- বাংলা প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান। প্রতি এক মাস অন্তর অন্তর (Live) অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। এছাড়া, নতুন অনুষ্ঠানের এক সপ্তাহ আগে এবং প্রতি মাসের শেষ বৃহস্পতিবার থেকে ৮ দিন সর্বশেষ অনুষ্ঠানটি পুণ:প্রচারিত হয়ে থাকে।

১৩) বাংলা অনুষ্ঠানে সম্প্রতি আমরা কিছু নতুন ধরণের অনুষ্ঠান সংযোজন করেছি। এর মধ্যে আমাদের তরুন প্রজন্মের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে বিষয় ভিত্তিক অনুষ্ঠান **"প্রজন্ম ভাবনা"**, বাংলার অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যের উপর **"আবহমান বাংলার অসাম্প্রদায়িক চেতনা"** উল্লেখ্য। এই অনুষ্ঠানগুলোতে বাইরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও অংশ গ্রহণ করছেন। এছাড়া আহমদীয়াত গ্রহণের ঈমান বর্ধক ঘটনাসমূহ নিয়ে **"আমি কেন আহমদী হলাম"** অনুষ্ঠানটিও যাত্রা শুরু করেছে। অদূর ভবিষ্যতে **"বাংলাদেশের জামা'ত পরিচিতি"** সহ আরো নতুন অনুষ্ঠান সংযোজনের পরিকল্পনা রয়েছে। এমটিএ-এর বাংলা অনুষ্ঠান বিষয়ে আপনাদের মতামত ও এর মান উন্নয়নে মূল্যবান পরামর্শ আহ্বান করছি।

অতএব, জামা'তের ভাই বোনদের কাছে বিনীত অনুরোধ

১) নিজেরা নিয়মিত এমটিএ দেখুন। হুযূরের খুতবা, বিশেষ অনুষ্ঠান, জলসা ও প্রতিদিন বাংলা অনুষ্ঠানের সময় যেন আপনার এমটিএ চালু থাকে তা নিশ্চিত করুন। পরিবারের প্রধান কার্যোপলক্ষ্যে বাইরে থাকলে, পরিবারে অন্য সদস্যরা যাতে এমটিএ দেখেন তা নিশ্চিত করুন, প্রয়োজনে মোবাইল ফোনে তাদের স্মরণ করিয়ে দিন।

২) জামা'তের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কর্মকর্তাগণ (অঙ্গসংগঠনগুলোসহ) জামা'তের দপ্তরে বা মজলিসের দপ্তরে কাজের সময় এমটিএ অনুষ্ঠান ছেড়ে রাখার অভ্যাস করুন।

৩) সাধারণ ডিশ/ক্যাবল লাইনে খবর ও গুরুত্বপূর্ণ/শিক্ষণীয় অনুষ্ঠান ছাড়া বেফজুল ও ক্ষতিকর অনুষ্ঠান দেখা থেকে নিজে বিরত থাকুন ও পরিবারের সদস্যদের বিরত রাখুন। আজকাল অপসংস্কৃতির কুফল নিয়ে অ-আহমদী সমাজও চিন্তিত।

৪) মনে রাখবেন, যুগ খলীফার সরাসরি তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে এবং শত শত কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা এমটিএ সম্প্রচারিত হচ্ছে মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য তাই এথেকে ফায়দা হাসিল করুন।

৫) আপনাদের সুবিধার্থে পাক্ষিক "আহমদী"-তে নিয়মিতভাবে অগ্রিম বাংলা অনুষ্ঠানের সূচি ছাপানো হচ্ছে। এছাড়া আমাদের জামা'তের বাংলা ওয়েব সাইট www.ahmadiyyabangla.org এবং ই-মেইলের মাধ্যমেও অনুষ্ঠান সূচী জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। দয়া করে এর সদ্ব্যবহার করুন। প্রতিমাসের অনুষ্ঠানসূচী আপনার টেলিভিশন সেটের কাছে ঝুলিয়ে রাখুন। মুরব্বী-মোয়াল্লেম, আমীর-প্রেসিডেন্ট সাহেবানকে এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান ও উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি। বিশেষ কারণে অনেক সময় এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল অনুষ্ঠানসূচীতে পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন, যেটি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

৬) যাদের এমটিএ ডিশ সংযোগ নেই, তারা চেষ্টা করুন যাতে নিজ বাড়ীতে এমটিএ সংযোগ লাগাতে পারেন, বর্তমানে খরচ সাধারণভাবে ৯০০০/= টাকা। ইন্টারনেটে www.mta.tv তে এমটিএ-এর অনুষ্ঠান দেখতে পারেন। এখন ওয়েবসাইটে হুযূর (আই.)-এর খুতবার সরাসরি বঙ্গানুবাদও শুনতে পারবেন।

অতএব এমটিএ দেখা অভ্যাসে পরিণত করুন, নিজের ও পরিবারের হেফাজত করুন।

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবার হাফেয ও নাসের হোন, আমীন।

আহমদ তবশীর চৌধুরী

ন্যাশনাল সেক্রেটারী অডিও-ভিসুয়্যাল এবং ইনচার্জ, এমটিএ বাংলাদেশ স্টুডিওস

বের হয়েছে! বের হয়েছে !!

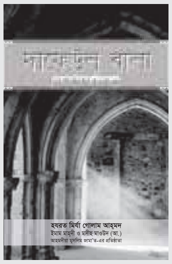

১। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কর্তৃক রচিত অত্যন্ত মূল্যবান বই 'দাফেউল বালা' (বালা মুসিবত প্রতিরোধক) বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে।

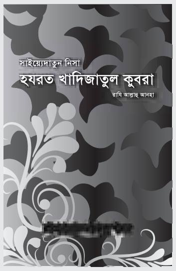

২। মৌলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেব রচিত 'সাইয়্যেদাতুন নিসা হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)' বইটি সদ্য প্রকাশিত হয়েছে।

৩। আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব রচিত 'কৃষ্ণের বিশ্বরূপ ও কল্কি জগতপতি' বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

সবকটি বই আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। আপনি আপনার কপিটি দ্রুত সংগ্রহ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা :
আহমদীয়া লাইব্রেরী
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মোবাইল নং : ০১৭৩৬১২৪৭০৪

সংবাদ

খুলনায় সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

খুলনা-সাতক্ষীরা জেলা মজলিস আনসারুল্লাহ্ ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনার যৌথ উদ্যোগে গত ১০-০৬-২০১১ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা-২০১১ খুলনার দারুল ফজলস্থ "বায়তুর রহমান" মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। জলসায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র মোহতরম সদর-এর প্রতিনিধি কায়েদ তবলীগ জনাব মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান। এই জলসায় আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান, মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান ও মওলানা মোহাম্মদ খোরশেদ আলম। এছাড়া আরো ছিলেন জেলা নায়েম ও স্থানীয় জামা'তের আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। জলসা অধিবেশনের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদ আহমদ পল্লব এবং নযম পরিবেশন করেন মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান।

এরপর পবিত্র কুরআনের আলোকে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শান ও মর্যাদা-এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন জেলা নায়েম ও স্থানীয় আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। অত:পর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শের উপর বক্তব্য রাখেন মুবাশ্বের মুরব্বী মওলানা মোহাম্মদ খোরশেদ আলম। এরপর নযম পরিবেশন করেন জনাব তানভীর আহমদ (শোভন)। সবশেষে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর দরূদ পাঠের গুরুত্ব ও ফজিলত এই বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মুবাশ্বের মুরব্বী।

পশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত জেরে তবলীগ মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মুবাশ্বের মুরব্বীগণ।

পরিশেষে সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান সীরাতুন্নবী (সা.) জলসায় আগত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালিত করার আহ্বান জানিয়ে দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জলসায় খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত পুরুষ ও মহিলা ৫৭ জন জেরে তবলীগ মেহমানসহ মোট ১৭১ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সীরাতুন্নবী জলসা অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ১৭ মে রোজ মঙ্গলবার উত্তর আহমদীপড়া হালকায় মহান সীরাতুন্নবী জলসা উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন লাজনা প্রেসিডেন্ট জনাবা শামীমা আক্তার লিলি। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন স্নিগ্ধা আক্তার। বাংলা নযম পরিবেশন করেন জাহানারা বেগম। হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন নাসিমা আসাদ, শিরীন খানাম, হেলেন বেগম, মাকসুদা ফারুক এবং প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। উক্ত জলসায় ৭০ জন লাজনা, ৩০ জন নাসেরাত ও ৮ জন জেরে তবলীগ মহিলা উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ করা হয়।

নাসিমা আসাদ

আখাউড়ায় খিলাফত দিবস উদযাপিত

গত ৩০/৫/১১ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আখাউড়ার উদ্যোগে খিলাফত দিবস উদযাতি হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব সালেহ মোহাম্মদ ভূঞা-এর সভাপতিত্বে উক্ত দিবসের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সৈয়দ তৈয়ব আহমদ, বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব মেযবাহ উদ্দিন খাদেম। ইসলামে খিলাফত ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন জনাব মনোয়ার আহমদ। শেষে সভাপতি খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা ও তার আনুগত্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। দোয়ার মাধ্যমে খিলাফত দিবসের কার্যক্রমের সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

সালেহ্ মোহাম্মদ ভূঞা

ধানীখোলায় খিলাফত দিবস উদযাপিত

গত ২৭ মে রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ধানীখোলায় খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে উক্ত দিবসের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মাঝহারুল হক। বাংলা নযম পেশ করেন তাহিরুল আফরাদ। খিলাফতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে জনাব ডা: মুস্তাফিজুর রহমান, জনাব তফাজ্জল হোসেন, মৌ. দাউদ আহমদ বোখারী, মোয়াল্লেম। সবশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ, দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়। এতে মোট ২১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

দাউদ আহমদ বোখারী

চরসিন্দুর জামা'তে খিলাফত দিবস উদযাপিত

গত ২৭ মে ২০১১ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চরসিন্দুরের উদ্যোগে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন-এর সভাপতিত্বে। দিবসের শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব তাহের আহমদ (প্রান্ত) এবং নযম পাঠ করেন জনাব ইমরান আহমদ এবং জোসেফ উল্লাহ্ সিকদার। মহান খিলাফত দিবসের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তৃতা করেন মৌ. আবুল কাসেম আনসারী, জনাব আফজাল হোসেন ভূইয়া, জনাব হাবিবুর রহমান এবং স্থনীয় মোয়াল্লেম মৌ. এস, এম মাহমুদুল হক। খিলাফতের দ্বিতীয় শতাব্দীতে যুগ খলীফার যে অঙ্গীকার আমাদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন তা পাঠ করেন সভাপতি। সবশেষে দোয়া এবং দুপুর বেলার খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে উক্ত খিলাফত দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত দিবসে ৩৯ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম, মাহমুদুল হক

বগুড়া লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র খিলাফত দিবস উদযাপন

গত ৩ জুন, শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ বগুড়ার উদ্যোগে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন সায়েমা সালেহা জিনিয়া। নযম পাঠ করেন মিসেস জেবুন নাহার ও একজন নাসেরাত আমাতুর রাফি। বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে নাজমুন নাহার শেফালী, সেরিয়া মাহফুজ, আমাতুল মজিদ ও জেবুন নাহার। সমাপনী বক্তব্য ও দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট নাজমুন নাহার শেফালী।

আমাতুল মজিদ

নও মোবাঈনদের তালিমী ক্লাস ও তবলিগী সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ০৭/০৫/২০১১ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্ সৈয়দপুরের উদ্যোগে দিলালপুর হালকায় নও মোবাঈনদেরকে নিয়ে একটি তালিম ক্লাসের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্লাস খাকসারের সভাপতিত্বে শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন নও মোবাঈন সদস্যা মর্জিনা খাতুন। উপস্থিত ৬ জন নও মোবাঈন সদস্যাকে নিয়ে নও মোবাঈন সিলেবাসের উপর তালিমী ক্লাস সম্পন্ন করা হয়। অত:পর সৈয়দপুর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে দিলালপুর হালকায় তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট হিসেবে খাকসার কুরআন হাদীসের আলোকে গয়ের আহমদী মহিলাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করি। ভাইস প্রেসিডেন্ট সায়ফুন নাহার বয়আতের ১০টি শর্তের উপর আলোচনা করেন। উক্ত তবলিগী সেমিনারে বাচ্চাসহ মোট ৩০ জন গয়ের আহমদী মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

তাহমিনা দেওয়ান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে নাসেরাত দিবস অনুষ্ঠিত

গত ০১/০৪/২০১১ রোজ রবিবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে চতুর্থ নাসেরাত দিবস সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন নাজিয়া সুলতানা। দোয়া পরিচালনা করেন বিলকিস তাহের, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর। এরপর নাসেরাতদের গ্রুপ অনুযায়ী কুরআন তেলাওয়াত, বক্তৃতা এবং বিভিন্ন রকমের খেলাধূলা, কুইজ ও স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়। দুপুরের খাবারের পরে দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন তামান্না হাছিন। এরপর নাসেরাতদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন আফরোজা মতিন, নাছিমা বশির, আতিয়া রহমান সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন লাজনা ইমাইল্লাহ্ প্রেসিডেন্ট। উক্ত নাসেরাত দিবসে ৪০ জন নাসেরাত ও ১০ জন লাজনা বোন উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে নাসেরাত দিবসের সমাপ্তি হয়।

মিলা পাটোয়ারী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকায় নও মোবাঈন সম্মেলন উদযাপিত

গত ১২ মে, ২০১১ বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে নও-মোবাঈন সম্মেলন-২০১১ উদযাপন করা হয়। সম্মেলনের সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইশরাত তাজিন, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঢাকা এবং প্রধান অতিথি ছিলেন ইশরাত জাহান, সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানটির মূল আকর্ষণ ছিল এবারই প্রথম নও মোবাঈন বোনদের অংশগ্রহণে পুরো অনুষ্ঠানটি তারাই পরিচালনা করেন। প্রথমেই কুরআন তেলাওয়াত করেন ফারজানা শহীদ শীলা। এরপর সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্ দোয়া পরিচালনা করেন এবং নও মোবাঈন বোনদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। হাদীস এবং মলফুযাত হতে পাঠ করে শুনান রুমা আক্তার। এরপর একজন নও মোবাঈনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন উম্মে হানী লুবা। নযম পরিবেশন করেন মাহফুজা রশীদ বীথি। এরপর শাহনাজ পারভীন ইসলামে নারীর মর্যাদা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। 'নও মোবাঈনদের জন্য আমাদের করণীয়' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন উজমা চৌধুরী। নও মোবাঈনদের পরিচিতি পর্বে নও মোবাঈনগণ একজন একজন করে পরিচিত হন। এরপর নও মোবাঈনদের লিখিত পরীক্ষা লেভেল ওয়ান ও লেভেল টুতে অংশগ্রহণকারী সবাইকে পরস্কৃত করা হয় এবং প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়। সবশেষে দোয়া ও আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১১ জন নও মোবাঈনসহ মোট ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সেলিনা তবসীর রুবী

লাজনা ইমাইল্লাহ তেজগাঁও-এর উদ্যোগে খিলাফত দিবস উদযাপিত

গত ১০/৬/২০১১ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ তেজগাঁও রাজাবাজার মসজিদ প্রাঙ্গনে লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও-এর পক্ষ থেকে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। এতে ১৩ জন লাজনা ও ৭ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। উক্ত দিবসে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মনিরা সিদ্দিকা। দোয়া করান স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট, ভিকারুন নেছা লুনা। ইসলামে খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মৌ. মাহমুদ আহমদ সুমন, স্থানীয় মোয়াল্লেম। নযম পেশ করেন ঐশী। খিলাফত আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যম এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ফারহানা মাহমুদ তন্বী। খিলাফত ও এতায়াতের গুরুত্ব এই বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন শারমিন ইমতিয়াজ। এ পর্যায়ে নযম পেশ করেন উপমা তানিয়া। পবিত্র কুরআন হাদীসের আলোকে খিলাফতের প্রতিষ্ঠান এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন লাকী আহমদ। খিলাফত একটা বরকতপূর্ণ সংগঠন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হৃদয়গ্রাহী ও পবিত্র বাণীর আলোকে বক্তব্য রাখেন ভিকারুন নেছা লুনা। পরিশেষে দোয়া ও আপ্যায়নের মাধ্যমে খিলাফত দিবসের কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ভিকারুন নেছা লুনা

ময়মনসিংহ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র খিলাফত দিবস উদযাপিত

গত ০২/০৬/১১ রোজ শুক্রবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ ময়মনসিংহের উদ্যোগে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট জ্যোস্নারা মিনহাজ এর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর নযম পাঠ করেন নোশিন আনজুম। খিলাফত দিবসের কল্যাণ, গুরুত্ব, তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য পেশ করেন রেবেকা সুলতানা, নাসিরুর রহমান ইনাব, মাহবুবা হাই এবং এশা। শেষে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট এর সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জ্যোস্নারা মিনহাজ

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র বার্ষিক বনভোজন পালন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে গত ২৮-০৫-২০১১ রোজ শনিবার বার্ষিক কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বনভোজনের আয়োজন করা হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নারায়ণগঞ্জের মসজিদ প্রাঙ্গনে সকাল ৯ ঘটিকায় দোয়ার মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। নামায যোহর ও আসর আদায় করার পর দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। খাবারের পর লাজনা ও নাসেরাত বোনদের মাঝে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বনভোজনে লাজনা নাসেরাত ও শিশুসহ মোট ৭২ জন অংশগ্রহণ করেন। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে বনভোজনের কার্যক্রম সমাপ্তি হয়।

উম্মে কুলসুম চায়না

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনায় নাসেরাত দিবস পালিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে গত ২৬/৫/২০১১ রোজ বৃহস্পতিবার নাসেরাতুল আহমদীয়া খুলনার উদ্যোগে নাসেরাত দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে সভানেত্রী ছিলেন দীনা নাসরিন, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন আছিয়া জামান নোভা। দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী এবং নযম পেশ করেন জাভীন মোবারক ঐশী।

এরপর নাসেরাতদের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল দ্বীনিমালুমাত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। সবশেষে দোয়া ও পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে নাসেরাত দিবসের কার্যক্রম শেষ করা হয়। এতে নাসেরাত ও লাজনাসহ মোট ২২ জন উপস্থিত ছিলেন।

রোকসানা মঞ্জুর

বগুড়া জামা'তে খিলাফত দিবস উদযাপিত

গত ২৭/০৫/১১ বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বগুড়ার উদ্যোগে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। দিবসের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মতিউর রহমান। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। নযম পাঠ করেন জনাব রবিউল ইসলাম। তারপর খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ নিয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। খিলাফত ও আনুগত্য নিয়ে আলোচনা করেন জনাব ফিরোজ আহমদ। এতে প্রায় ৩০ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। তারপর দোয়া ও সভাপতির ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বগুড়ার হালকা সিরাজগঞ্জে তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৯/০৫/১১ বগুড়া জামা'তের হালকা সিরাজগঞ্জে এক তবলিগী সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে মোট ১১ জন সদস্য/সদস্যা এবং জেরে তবলীগসহ উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ, জোনাল ইনচার্জ এবং মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম ও জনাব আব্দুস সালাম, প্রেসিডেন্ট সিরাজগঞ্জ হালকা। আলোচনার পর ২ জন বয়আত গ্রহণ করেন। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে তবলীগি অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

মাহিগঞ্জ জামা'তে খিলাফত দিবস উদযাপিত

গত ২৭ মে রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মাহিগঞ্জ জামা'তে খিলাফত দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত খিলাফত দিবসে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ খালেদুল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট, মাহিগঞ্জ। দিবসের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মনিরুল ইসলাম। এরপর দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। উর্দু নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম। এরপর খিলাফত দিবস উপলক্ষ্যে বক্তৃতা পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন, জনাব মোহাম্মদ আশরাফ মিয়া। বাংলা নযম পেশ করেন জনাব সুজন মিয়া এরপর বক্তৃতা করেন মৌ. এস, এম, রাশিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম। বক্তারা খিলাফত দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। সবশেষে সভাপতির বক্তৃতা, দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত দিবসে মোট ৮২ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আলাউদ্দিন মিয়া

কটিয়াদী জামা'তে খিলাফত দিবস উদযাপন

গত ৫/৬/২০১১ তারিখে স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে কটিয়াদি জামা'তে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব হাফেজ আবদুল মান্নান। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। নযম পেশ করেন জনাব সজিব আহমদ। খিলাফত ঐশী ব্যবস্থা এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌ. বশির আহমদ, মোয়াল্লেম। খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ আবুল কাশেম ভূইয়া। ইসলামে খিলাফতের ধারাবাহিকতা এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মওলানা রবিউল ইসলাম, মোবাশ্বের মুরব্বী। দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ রুহুল আমীন

নূরনগরে খিলাফত দিবস উদযাপন

গত ২৭/০৫/২০১১ বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নূরনগর/ইশ্বরদীর উদ্যোগে খিলাফত দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান-এর সভাপতিত্বে দিবসের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ সাব্বির আহমদ খান ও নযম পাঠ করেন জনাব মোবাশ্বের আহমদ। উক্ত দিবসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খিলাফতের গুরুত্ব ও খলীফাদের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন যথাক্রমে জনাব মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন মোল্লা এবং মোহাম্মদ সাব্বির আহমদ খান। সবশেষে সভাপতির ভাষণ, দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে মোট ২৫ জন সদস্য সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান

নাটাই জামা'তে খিলাফত দিবস উদযাপন

গত ২৭/০৫/১১ বাদ জুমুআ স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সালাউদ্দিন করীম (বাবু), নযম পাঠ করেন জনাব রুবেল সিকদার। এতে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আহসান উল্লাহ্ সিকদার খিলাফতের মহান উদ্দেশ্য সমূহ সম্পর্কে। খিলাফতের নেতৃত্বেই ইসলামের বিশ্ববিজয় এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব রুবেল সিকদার। উক্ত দিবসে ৩৪ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আহসান উল্লাহ্ সিকদার

নুসরতাবাদ চরদুঃখিয়ায় খিলাফত দিবস উদযাপন

গত ২৭/০৫/২০১১ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নুসরতাবাদ, চরদুঃখিয়া-এর উদ্যোগে খিলাফত দিবস উদযাপিত হয়। স্থানীয় জামা'তের যয়ীমে আলা জনাব আবু জুবায়ের (ফরিদ) এর সভাপতিত্বে উক্ত দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মেহেদী হাসান (জয়), নযম পরিবেশন করেন জনাব মোর্তুজা আহমদ তানভীর। অত:পর ইসলামে খিলাফত, খিলাফত-এর কল্যাণ, খিলাফতের আনুগত্য এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জনাব নাসির আহমদ পাটওয়ারী, জনাব ডাক্তার বশির আহমদ পাটওয়ারী এবং মৌ. এস, এম আবদুল হক, মোয়াল্লেম। দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ৫২ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

নাসির আহমদ পাটওয়ারী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নুসরতাবাদ চরদুঃখিয়ায় খিলাফত দিবস পালিত

গত ২৮/০৫/২০১১ রোজ শনিবার বাদ আসর লাজনা ইমাইল্লাহ্ নুসরতাবাদ চরদুঃখিয়ার উদ্যোগে খিলাফত দিবস পালন করা হয়। দিবসের সভাপতিত্ব করেন রহিমা বেগম। শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন ফাহাদ সুলতানা (ইকরা), নযম পরিবেশন করেন ফাতেমা খাতুন (স্মৃতি)। অত:পর ইসলামে খিলাফত, খিলাফতের কল্যাণ, খলীফার আনুগত্য এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে রাজিয়া সুলতানা, বিলকিস হক, খাতুনে জান্নাত মুক্তি। দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। লাজনা ও নাসেরাতের উপস্থিতি ছিল উৎসাহ জনক।

রাজিয়া সুলতানা

বটিয়াপড়ায় খিলাফত দিবস উদযাপন

গত ২৭ মে ২০১১ বটিয়াপাড়া জামা'তে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে খিলাফত দিবসের সূচনা হয়। নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসেন। বক্তৃতা পর্বে খিলাফত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন জনাব ডা. মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান। খিলাফতের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ আমিনুজ্জামান। খিলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :

ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 73 | 24th Issue

The Fortnightly Ahmadi

30 June, 2011 Tk. 15.00

Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**

Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com